দূরভাষিণী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ

আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রকাশক

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত

ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড

২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

শ্রীবিমল গোস্বামী

মুদ্রক

পি, বি, টাট

এইচ, এস, প্রেস

বরাহনগর

কলিকাতা—৩৬

প্রুফ-রীডার

দ্বন্দ্ব মিত্র

আড়াই টাকা

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

লেখকের অন্যান্য বই—

ছোট গল্প

অসমতল

হলদে বাড়ি

উল্টোরথ

পতাকা

চড়াই উৎরাই

শ্রেষ্ঠ গল্প

উপন্যাস

দ্বীপপুঞ্জ

অক্ষরে অক্ষরে

দেহমন

নতুন বছরের যে ডায়েরিখানার আমি স্বত্বাধিকারী হয়েছি তাতে স্ট্রিট ডাইরেক্টরী নেই, অথচ বৃন্দাবন পাল বাই লেনের ভৌগোলিক অবস্থানটি ঠিক যথাযথভাবে জেনে নেওয়া আমার প্রয়োজন। দেরাজের ভিতরে খোঁজাখুঁজি করতে ১৯৪৮ সনের একখানা পকেট ডায়েরি উঠে এল। আর তার শেষের দিকের পাতাগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটি পাতায় আমার আঙ্গুলটা একটুকাল অনড় হয়ে রইল।

'বীণা গুহ ঠাকুরতা, ১৩।৩ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন।' বৃন্দাবন পাল বাই লেনের অবস্থান বের করবার পরেও আবও একবার বীণা গুহ ঠাকুরতার পাতাটা খুললাম। একটি মেয়ের হাতের লেখা বলে বেশ চেনা যায়, তবে অক্ষরগুলি ঠিক একেবারে গোট-গোট নয়। বরং একটু টানা টানা জড়ানো ধাঁচের।

ওয়েলেসলী আর ধর্মতলার মোড়ের চায়ের দোকানটিতে বসে আমার ডায়েরির পাতায় নাম ঠিকানা লিখতে লিখতে বীণা গুহ ঠাকুরতা সেদিন বলেছিল, 'নিন, আমাকে দিয়েই লেখালেন শেষ পর্যন্ত, মানুষের হাতের লেখা কতদূর খারাপ হ'তে পারে আপনার ডায়েরিতে তার নমুনা রইল।'

হাতের লেখা নিয়ে বিনয় করতে মেয়েরা ভালবাসে। কিন্তু ওর বিনয়ের ভঙ্গিটুকু কেমন বেশ নতুন নতুন লাগল। বললাম, 'কেন আপনার হাতের লেখা তো ভালোই।' বীণা ডায়েরিটা আমাকে ফেরৎ দিতে দিতে বলেছিল, 'ভালো? সাক্ষাতে ভালো ছাড়া আর কি বলবেন। তারপর বাসায় গিয়ে শুধু যে হাতের লেখাই খারাপ লাগবে, তাই নয়, আমার সম্বন্ধে আরও খারাপ খারাপ সাংঘাতিক সব মন্তব্য পাতা ভরে নোট করে রাখবেন। তারপর তাই নিয়ে হয়তো বেরুবে এক গল্প।'

হেসে বলেছিলাম, 'গল্প একটা আপনাকে নিয়ে না লিখে পারব না।'

বীণাও হেসেছিল, 'আমি গোড়া থেকেই তা আন্দাজ করেছি।'

কিন্তু এই তিন বছরেও বীণার আন্দাজ আর আমার প্রতিশ্রুতি কোনটাই সফল হয় নি। গল্প লেখা হয়নি বীণা গুহ ঠাকুরতাকে নিয়ে। লেখার কথা অনেকদিন ভেবেছি, তাগিদ পেয়ে অনেকদিন অনেক রকম করে সুরুও করেছি কিন্তু কোনবারই দু'তিন পাতার বেশি এগোয় নি।

অবশ্য অনেক গল্পেরই এমন দশা হয়; সুরু হয়, শেষ হয় না। জল্পনার জটা-জালে আবদ্ধ সুরধুনীর কুলুকুলু নাদ কিছুদিন খুব শুনি, তারপর একদিন সে কলধ্বনি আপনিই বন্ধ হয়ে যায়।

বীণা গুহ ঠাকুরতাকে নিয়ে প্রথম গল্প লেখার খেয়াল হয়েছিল অবশ্য আমাদের মৃন্ময় নন্দীকে দেখে। মৃন্ময় আমাদের সুপ্রভাত দৈনিক পত্রিকার জুনিয়ার রিপোর্টার। তার একটি বদ অভ্যাস ছিল। টেলিফোনের কাছে যদি সে একবার বসত আর নড়তে চাইত না। সে যে কেবল সংবাদ সংগ্রহই করত, তা নয়, ফাঁফে ফাঁকে ব্যক্তিগত আলাপও চালাত। মৃন্ময় খুব টেলিফোন-প্রিয় তা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু চীফ রিপোর্টার সুরেন সমাদ্দার একদিন ওর অসাক্ষাতে বললেন, 'ওর এত টেলিফোন-প্রিয়তার কাবণ কি জানেন? টেলিফোন অফিসে মৃন্ময়ের একটি প্রিয়াও আছে। আপনি তো গল্প-টল্প লেখেন, লিখুন না একটা গল্প।'

হেসে বললাম, 'তা লেখা যায় বৈকি। এক অফিসে কর্মব্যস্ত এক সাংবাদিক, আর এক অফিসে কর্ম-ক্লান্ত এক ফোন অপারেটার। ফাঁকে ফাঁকে নিষিদ্ধ সংলাপের ছিঁটে। বেশ গল্প হ'তে পারে।'

এর পর একদিন মৃন্ময়কে ধরলাম, 'আচ্ছা মৃন্ময়বাবু, আপনার তো অনেক রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনি। কোন টেলিফোন অপারেটারের সঙ্গে আলাপ-টালাপ কিছু আছে?'

মৃন্ময় ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'কেন, বলুন তো?'

বললাম, 'সেই রকমই যেন অনুমান হয়।'

মৃন্ময় বলল, 'কি দেখে এমন অনুমান আপনার হোল?'

বললাম, কতকগুলি লক্ষণ দেখেই অবশ্য এ অনুমান হয়েছে। ফোনের কাছে যেতে আপনার অদ্ভুত উৎসাহ। একটু সময় পেলেই ফোন গাইডটা আপনি নাড়া-চাড়া করেন। আর কি অসীম মমতার সঙ্গেই না ফোনের হাতল ধরেন আপনি, যেন হাতল থেকে 'ল'টা খসে গেছে।'

মৃন্ময় হেসে উঠল, 'আপনার Power of observation-কে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আচ্ছা ধরুন, আপনার অনুমান ঠিক। কারো সঙ্গে আমার আলাপই না হয় আছে, কিন্তু এখবর পেলে কি করবেন আপনি?'

বললাম, 'এ খবর জানবার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করব।'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'বটে! আপনার ধরণ-ধারণ তো মোটেই সুবিধার লাগছে না। এ রকম অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করতে পারব না, মাপ করবেন। মতলবখানা কি খুলে বলুন তো?'

বললাম, 'খুবই সাধু উদ্দেশ্য। একটি গল্প লিখব। জানেন তো, লিখতে হলে শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করা যায় না! জেনে শুনে বাস্তব বনিয়াদটা একটু শক্ত করে নিতে হয়।'

মৃন্ময় লাফিয়ে উঠল, 'তাই বলুন, রীতিমত বিজ্‌নেস, দু'পয়সা রোজগারের ফন্দি। গল্পের টাকা পেয়ে কত পার্সেণ্ট কমিশন দেবেন বলুন? যা হোক, আগাম এক কাপ চা এখনকার মত খাইয়ে দিন।'

তিন চার দিন বাদে একদিন মৃন্ময় এসে বলল, 'যাবেন তো চলুন।'

মাথা নিচু ক'রে সংবাদ অনুবাদ করছিলাম, মুখ তুলে বিস্মিতভাবে বললাম, 'কোথায়?'

মৃন্ময় বলল, 'আকাশ থেকে পড়লেন যে? আলাপ করবেন বলেছিলেন, ভুলে গেলেন না কি?'

বললাম, 'ও এখানে এসেছেন নাকি তিনি?'

মৃন্ময় বলল, 'ক্ষেপেছেন? তিনি আসবেন কেন এখানে? গরজ আপনার, আপনি যাবেন।'

বললাম, 'কোথায় যেতে হবে?'

মৃন্ময় বলল, 'যেখানে টেনে নিয়ে যাই সেখানে।'

হাতের কাজ শেষ করে উঠে পড়লাম। ট্রামে উঠে আমার পাশে জায়গা না থাকায় ঠিক পিছনের সীটে গিয়েই বসল মৃন্ময়। তারপর সেখান থেকেই আমার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা কিন্তু রেষ্টুরেণ্টেই করেছি, তৈরী হয়ে এসেছেন তো?'

জবাব না দিয়ে একটু হাসলাম।

মৃন্ময় বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম ওদের বাসাতেই নিয়ে যাব। কিন্তু একখানা মাত্র ঘর, তার মধ্যে বাপ-মা ভাই-বোনেরা মিলে জন দশেকে থাকে। তাছাড়া আবার অসুখ বিসুখ আছে। আপনার অসুবিধে হোত। এই যে, নামতে হবে এখানে, আসুন।'

ধর্মতলা আর ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রামটা থামতেই মৃন্ময় ভিড় ঠেলে দোরের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও ওর পিছনে পিছনে গিয়ে নেমে পড়লাম। মৃন্ময়কে পার্কের ভিতরে ঢুকতে দেখে বললাম, 'ওদিকে কেন? চায়ের দোকানের কথা বলছিলেন না?'

মৃন্ময় বলল, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কেবল চা-ই তো চাই না আপনার।'

পার্কের ভিতরে বৈকালিক ভ্রমণার্থীদের ভিড়। মৃন্ময় এদিক ওদিক তাকিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এসেছে। চলুন।'

একটু ফাঁকে একখানা বেঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় বসে একটি মেয়ে আনমনে চীনাবাদামের খোসা ছাড়াচ্ছিল, আমরা কাছে যেতেই তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ হয়ে বাদামের ঠোঙাটাকে আড়াল করে উঠে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বুঝি তোমার পাঁচটা? কতক্ষণ ধরে চুপ চাপ বসে আছি।'

মৃন্ময় বলল, 'একেবারে চুপ চাপ? চীনাবাদাম চিবুবার শব্দ কিন্তু আমরা আধমাইল দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। আহা, বাদামগুলি তাই বলে ফেলে দিলে কেন, আমরাও না হয় ভাগ পেতাম।'

মেয়েটি বলল, 'ভাগ চাও তো আবার কেনা যাবে, ওতে আর বাদাম নেই, শুধু খোসা।'

মৃন্ময় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল, 'এঁর কথাই বলছিলাম। কাজ করেন আমাদের সঙ্গে, আর একটি কুকাজও করেন। গল্প লেখেন! তোমার কাছ থেকে সেই গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেই ওঁর আসা আর ইনি শ্রীমতী বীণা গুহ ঠাকুরতা। —ফোন অপারেটর।'

নমস্কার বিনিময়ের সময় চেহারাটা একটু তাকিয়ে দেখলাম। দর্শকের চোখকে প্রসন্ন করবার মত আকৃতি বীণার নয়। বয়স কুড়ি একুশের কম হবে না, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় একটি বালিকার মতই অপুষ্ট। দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের ক্ষীণতাটা চোখে লাগে। গায়ের রঙ কালো। কিন্তু চোখ-মুখের গড়নটুকু মোটামুটি মন্দ নয়। নাকটি চোখা, ভ্রূ দুটি টানা। ছোট্ট কপালের ওপর সামনের চুলগুলি একটু কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। ফিকে হলুদ রঙের একখানি শাড়ি পরনে। হাতে দু'গাছি প্লাষ্টিকের চুড়ি। আর কোথাও কোন ভূষণের চিহ্ন নেই।

রূপে গুণে অবস্থায় বীণার তুলনায় মৃন্ময় অনেক স্বচ্ছল। সুপুরুষ না হলেও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বয়স বছর সাতাশ আঠাশ হবে। কিছু কমও হতে পারে। সামনের দিকে টাকের আভাস পড়ায় হঠাৎ একটু বেশি বলেই মনে হয়। গড়নটা একটু মোটা সোটা। ফর্সা রঙ, চেহারার সঙ্গে বেশ খুলেছে। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বেশির ভাগ দিনই ছাই রঙের স্যুট পরে। বিজাতীয় পোষাক প্রীতির কৈফিয়ৎ হিসাবে মৃন্ময় বলে যে, ধুতী পাঞ্জাবী প'রে সহরের ঘটনার পিছনে ছুটোছুটি করা চলে না। তাহ'লে নিজেই কোন এক দুর্ঘটনার ভিকটিম হতে হবে। বেশ স্ফূর্তি আছে কথায় বার্ত্তায়, চাল চলনে। এখনো বিয়ে থা করেনি। সংসারে নিজের বাপ মা আর বাপ-মা মরা ছোট একটি ভাগ্নী আছে। অফিসে শ'দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ভাড়া বাড়ীতে বাস করে আজকালকার দিনে তিন চার জন লোকের খরচ চালাবার পক্ষে দেড়শো টাকা প্রায় কিছুই নয়। কিন্তু মৃন্ময় বেশ ধোপদুরস্ত টিপটপ থাকতে জানে। মুখেও কোনদিন মালিন্যের ছাপ দেখিনে। মনে মনে ভাবলাম এই ক্ষীণকায়া ক্ষীণপ্রাণা ফোন অপারেটারটিই কি ওর সমস্ত উৎসাহ উল্লাসের মূল?

মৃন্ময় বলল, 'বাঃ, দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলেন যে। বসুন। এখানেই বসবেন না কোন রেষ্টুরেণ্ট টেণ্টে যাবেন। চা ছাড়া কি আলাপ জমবে?'

বীণা বলল, 'কেন জমবে না? সবাইতো আর তোমার মত চা-লোভী নয়।'

মৃন্ময় বীণার দিকে তাকাল, 'লোভী? এতদিন পরে এমন একটা কড়া গাল দিলে আমাকে? আমার তো মনে হয় আমার মত এমন নির্লোভ পুরুষ আর দুনিয়ায় নেই।

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃন্ময় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়?'

আমার মনে হচ্ছিল বীণার মুখের রঙ একথায় যেন একটু পালটেছে। যেন লজ্জায় আর একটু কোমল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। কিন্তু জবাবে সেকথা উল্লেখ না করে বললাম, 'অন্য লোভের কথা জানিনে, তবে চায়ের লোভ আপনার কিছু আছে। অবশ্য চায়ের লোভটাকে ঠিক লোভ বলা যায় না।'

মৃন্ময় বলল, 'আমিও তাই বলি। চায়ের লোভটা মোটেই লোভ নয়। চা সবাইর কাছেই চাওয়া যায়। হ্যাঁ, কাটলেট অমলেটের দাবী যদি করতাম তাহলেও না হয়—'

বীণা সহজ হবার চেষ্টা করে বলল, 'আহা, কাটলেট অমলেট যেন মোটে চলেই না। জানেন রেষ্টুরেণ্টে এত পয়সা ব্যয় করে—'

হেসে বললাম, 'সত্যি নাকি? অফিসে মৃন্ময়বাবুর কৃপণ দুর্নাম আছে। হাত দিয়ে চা গলে না।'

এগুতে এগুতে মোড়ের রেষ্টুরেন্টটায় গিয়ে ঢুকলাম। সান্ধ্য চা-পায়ীদের সংখ্যাধিক্যে দোকান বেশ সরগরম হ'য়ে উঠেছে। কাটা দরজা ঠেলে পিছনের দিকের ছোট একটা কেবিনে গিয়ে বসলাম আমরা। রেষ্টুরেণ্টের পরিচারক এসে সামনে দাঁড়াতে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কি খাবেন ?'

মৃন্ময় নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'যা খাওয়ান। একেই তো লোভী বলে দুর্নাম রটেছে, তারপর যদি আবার ফরমায়েস করি—'

বীণা বলল, 'নিশ্চয়ই। ওঁর তো ফরমায়েস করা উচিতই নয়।'

বললাম, 'কেন ?'

বীণা বলল, 'বরং আপনিই বলুন কি খাবেন। আপনিই তো আজ আমাদের অতিথি।'

হেসে বললাম, 'ও সেই কথা। বেশ তো আতিথ্য আর একদিন নেওয়া যাবে। আজ না হয় আপনারাই আমার অতিথি হলেন। তা'ছাড়া মৃন্ময়বাবুকে চা-খাওয়াবার প্রতিশ্রুতিও আমি দিয়েছিলাম।'

বীণা বলল, 'কেন ?'

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন, সেই সর্তে।'

বীণা একটু হাসল, 'মিছামিছি চায়ের পয়সাটাই আপনার নষ্ট।'

'কেন।'

'আমাদের মত লোকের সঙ্গে আপনার আলাপ করে কি লাভ ?'

বললাম, 'দেখি কিছু লাভ টাভ হয় নাকি।'

বীণা বলল, 'শুনেছি ফোন অফিস আর ফোন অপা-রেটরদের সম্বন্ধে আপনার খুব কৌতুহল আছে।'

বললাম, 'মৃন্ময়বাবু বলেছেন বুঝি ?'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু বাইরে থেকে কতকগুলি কথা শুনে কি আপনি সব বুঝতে পারবেন ?'

বললাম, 'সেটা আপনার বুঝাবার ক্ষমতা আর আমার বুঝবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।'

বীণা বলল, 'বেশ তো, আপনার কি কি জিজ্ঞেস করবার আছে করুন। ওকি আবার কাটলেট কেন ? চা-টোষ্টই তো যথেষ্ট ছিল। আপনি কি রাগ করলেন ?'

হেসে বললাম, 'না, রাগ করে আপনাকে কাটলেট খাওয়াচ্ছি না।'

মৃন্ময়ের দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়ে নিয়ে বীণা বলল, 'কেউ কেউ রাগ করেও খাওয়ায়।'

এরপর ফোন অফিস নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। বীণা জানাল, মাত্র বছরখানেক ধরে সে কাজ করছে। সব বিভাগের সব রকম খোঁজ খবর সে দিতে পারবে না। ট্রেনিং পিরিয়ড, মাইনের স্কেল, সিফটের নিয়ম,

স্যুইচ বোর্ড সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্যগুলি সে বলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মৃন্ময় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'এসব টেকনিক্যাল ব্যাপার বুঝতে হলে ভিতরে গিয়ে আপনার একবার ঘুরে আসা দরকার।'

বীণা বলল, 'শুধু একবার ঘুরে এলেই হয়, এই বুঝি তোমাদের ধারণা?'

বললাম, 'তবে?'

বীণা একটু হাসল, 'অপারেটরদের নিয়ে গল্প লিখতে হলে আপনাকেও কিছুদিন অপারেটরী করতে হবে। তা-হলেই বুঝবেন কি সুখে শান্তিতে আমরা সেখানে ঘর সংসার করছি।'

মৃন্ময় ঘড়ির দিকে তাকাল, 'আমাকে আবার একটি মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে হবে।'

বীণা বলল, 'মিটিং এ্যাটেণ্ড না করতে হলেও আমরা এখানে বসে থাকব না।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন না আর একদিন।'

বললাম, 'কোথায়? এই রেষ্টুরেণ্টে না অফিসে?'

বীণা হেসে বলল, 'আমরা বুঝি শুধু রেষ্টুরেণ্টে আর অফিসেই থাকি? বাসা-টাসা কিছু নেই? বাসায় আসুন।'

বললাম, 'কিন্তু শুনেছিলাম বাসায় অসুবিধে আছে।'

বীণা বলল, 'মৃন্ময়দা বলেছেন বুঝি? তা থাকলই বা অসুবিধে, আমরা এতগুলি লোক দিনরাত সেখানে থাকতে পারছি, আর আপনি খানিকক্ষণ পারবেন না?'

বললাম, 'আমি খুবই পারব। আপনাদের অসুবিধের কথাই ভাবছিলাম।'

বীণা হেসে বলল, 'অসুবিধার কথা ভেবে লাভ নেই। আপনি আসুন।'

পকেট থেকে ডায়েরিটা বের করে বললাম, 'তাহলে ঠিকানাটা লিখে নিই। রাস্তার নাম নম্বর ভুল করবার ক্ষমতা আমার অসাধারণ।'

কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি কলম শুকনো, কালি ভরে আান হয় নি।

বীণা ব্লাউসের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি নিজের পেনটা খুলে দিল, 'এটা দিয়ে লিখুন, কিন্তু এ কলমে কি আপনি লিখতে পারবেন। কি যেন হয়েছে পেনটার। মাঝে মাঝে ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়।'

পকেট ডায়েরিটা বীণার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, তা হলে নিজের নাম ঠিকানাটা নিজেই লিখে দিন।'

বীণা একটু যেন লজ্জিত হোল, 'বরং আমাদের খাতায় লেখকেরা অটোগ্রাফ দেবেন। তাইতো নিয়ম।'

বললাম, 'সে নিয়ম বিখ্যাত লেখকদের বেলায় খাটে। অখ্যাত লেখককে পাঠিকার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়।'

'তাই নাকি ?'

আমার দিকে তাকিয়ে বীণা একটু মৃদু হাসল, তারপর ডায়েরির পাতায় ওর নাম ঠিকানা লিখতে লাগল।

বাসায় ফিরে গিয়ে মনে হোল সন্ধ্যাটা একেবারে মন্দ কাটে নি। মেয়েটির মুখ তত সুন্দর নয়, কিন্তু মুখের কথাগুলি ধারাল, হাসিটুকু মিষ্টি। অনেক সময় একটু হাসি, একটু কথা, একটু ভালো লাগা—এসব ছোট ছোট জিনিষই ছোট গল্প লেখার বড় রকমের প্রেরণা হয়ে ওঠে। ওকে নিয়েও হয়তো একটা গল্প লেখা অসম্ভব হবে না। মৃন্ময় আর ওর সম্পর্কের মধ্যে খানিকটা গল্পের উপাদান তো এরই মধ্যে আন্দাজ করা গেল।

কথা ছিল পরের সপ্তাহেই যাব ওদের বাসায়। টেলিফোন সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু সিফটের ডিউটির কি রকম অদলবদল হয়ে গেল। মৃন্ময়ের কাছে খবর নিয়ে জানলাম দুজনের ছুটি আর কাজ এমন আলাদা আলাদা সময়ে পড়েছে যে দেখা সাক্ষাতের সুবিধে নেই। এর মধ্যে মৃন্ময় একদিন বলল, 'ও জিজ্ঞেস করছিল আপনার কথা। বলছিল গল্পে হাত দিলেন নাকি।'

হেসে বললাম, 'গল্প তো আপনাদের হাতে।'

সপ্তাহ দুই বাদে সাক্ষাতের স্থানকাল ফের স্থির করা

গেল। কিন্তু যাওয়ার দিন মৃন্ময় হঠাৎ বলে বসল, 'দেখুন আপনি যান, আমার আজ সময় হয়ে উঠবে না। অন্য কাজ আছে।'

বললাম, 'সেকি!'

মৃন্ময় বলল, 'তাতে অসুবিধের কি আছে। ডায়েরিতে ঠিকানা টোকা আছে। চিনে যেতে পারবেন না?'

বললাম, 'পারব আর না কেন।'

মৃন্ময় অদ্ভুত একটু হাসল, 'খুব পারবেন। চিনে যাওয়া খুবই সহজ, বেরিয়ে আসাটাই কঠিন।'

বললাম, 'তার মানে?'

কিন্তু মৃন্ময় ততক্ষণে চীফ রিপোর্টারের ঘরে ঢুকে গেছে।

যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলাম। বাড়িটি একটু ভিতরের দিকে। একটা বাই লেনের মধ্যে। সামনে একটা ল্যাম্প পোষ্ট। বাতি এখনো জ্বলে নি।

ছিপছিপে লম্বা কোল কুঁজো ফতুয়া গায়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'দেখুন ফোরটিন বাই থ্রি—'

ভদ্রলোক সামনের লাল রঙের পুরোণ তেতলা বাড়ীটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'ওই তো দেখতেই পাচ্ছেন। কেন, ওবাড়িতে কাকে চান?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আমি বীণা দেবীর কাছে এসেছি। বীণা গুহ ঠাকুরতা।

ভদ্রলোক রুক্ষ গলায় বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আর বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি। কেন, তার কাছে কি দরকার আপনার?'

কথার ভঙ্গিটা ভালো লাগলো না। তবু একটু হেসেই বললাম, 'সে খবরে আপনারই কি খুব প্রয়োজন আছে?'

'আলবৎ আছে। আমি বীণার বাবা। আমার নাম গিরীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা।'

নমস্কার করে বললাম, 'ও। আমিও সেই রকমই অনুমান করছিলান।'

গিরীনবাবু রেগে উঠলেন, 'এর আবার অনুমানের কি আছে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, সাক্ষী প্রমাণ চাই নাকি আপনার?'

বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়ে সবিনয়ে বললাম, 'আজ্ঞে না।'

গিরীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন? কি নাম আপনার?'

'দেখুন, নাম বললে তো ঠিক চিনতে পারবেন না। আমি মৃন্ময়বাবুর বন্ধু। একই অফিসে কাজ করি।'

মৃন্ময় এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, অনেক উপকার করেছে, বাসা খুঁজে দিয়েছে, বীণার চাকরির ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে এসব খবর আগেই শুনে-

ছিলাম। তাই ভাবলাম, সহকর্মীর দোহাই দিলেই এখানে সুবিধে হবে। কিন্তু ফল হোল একেবারে উল্টো। গিরীন বাবু আরো চটে উঠলেন, 'এক অফিসে কাজ করেন? তা-তো করবেনই, রতনে রতন চেনে। যান, বীণা বাসায় নেই, দেখা হবে না তার সঙ্গে।'

আমি কি জবাব দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ গিরীনবাবুর পিছন থেকে পরিচিত স্বর শুনতে পেলাম, কি সুরু করেছ বাবা। ছিঃ। তুমি যে কাজে যাচ্ছিলে যাওনা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বীণা একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'আসুন দেরি দেখে ভাবলাম আজ বুঝি আর এলেন না ; আজও তারিখ বদলালো।'

বললাম, 'তারিখ বদলালেই ভালো ছিল। এবার যাই।'

বীণা বলল, 'না-না সে কি হয়।'

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে গিরীনবাবুর আচার ব্যবহারও পালটে গেল। তিনি পরম সৌজন্যের সুরে বললেন, 'সেকি বলছেন। দয়া করে এসেছেন যখন দোর গোড়া থেকে ফিরে যাবেন সে কি হয়। জানেন, গৌরপুরের গুহ ঠাকুরতাদের বংশে সে রেওয়াজই মোটে নেই। আজই না হয় এই অবস্থা, ভাড়াটে বাড়িতে থাকি, কেরাণীগিরি করে খাই। ধন জন যৌবনের তো কেউ কোনদিন বড়াই করতে পারে না। কিন্তু বংশের রীতি নীতি মান মর্যাদা আলাদা জিনিষ। আসুন।'

বীণা আর একবার আপত্তি করল, তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও না।

গিরীনবাবু বললেন, যাব যাব। যাওয়ার সময় যায়নি এখনো। ভদ্রলোক বাড়িতে এলেন একটু আলাপ টালাপ করি। 'কোথায় বাড়ি আপনার?'

'ফরিদপুর।'

'ও তাই বলুন। একই দেশের লোক।'

'বললাম আপনারও বাড়ি ফরিদপুরে নাকি?'

'না বরিশালে। কিন্তু ফরিদপুরের অনেক জায়গায় আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে। আর মশাই এখন ফরিদপুরও যা বরিশালও তা। সবই তো পাকিস্তান।'

সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একেবারে তেতালায় উঠতে হল। বাড়ি ভরা ঘর, ঘরে ঘরে ভাড়াটে। গিরীনবাবু বলতে বলতে চললেন, 'মশাই বলবার সময় তো ভালই লাগে। বেশ গলা উঁচু করেই লোকের সামনে বলতে পারি তেতলায় থাকি। কিন্তু উঁচুতে থেকেও সুখ নেই, গুষ্টিশুদ্ধ দিনরাত কেবল সিঁড়ি বেয়ে উঠি আর নামি। জল কল পায়খানা সব নিচে। আর রান্নার ব্যবস্থাটি ছাদের ওপর। আসুন এই আমাদের ঘর।'

হাত খানেক চওড়া করিডোরের দক্ষিণ প্রান্তে মাঝারি আকারের একখানা ঘরের সামনে গিরীনবাবুর দেখাদেখি আমিও চৌকাঠের বাইরে জুতা রেখে ভিতরে ঢুকলাম। ঘরের

আধখানা জুড়ে বড় একখানা সেকেলে খাট, পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি। তাতে ঠেস দেওয়া জড়ানো একটা পাটি। পূব দিকের দেয়ালের পাশে খবরের কাগজের উপর কতকগুলো স্কুলপাঠ্য বইপত্র ছড়ানো।

গিরীনবাবু বললেন, 'উঠে বসুন, পা তুলে ভালো হয়ে বসুন না। মশাই চেয়ার টেবিল, টুল জলচৌকি, বসবার জিনিষের কি অভাব আছে বাড়িতে? কিছুই আনতে পারিনি। আনব কোথায়। যা এনেছি তাই নিয়েই গিন্নীর সঙ্গে নিত্য ঝগড়া, জিনিষ রাখতে হলে আরো ঘর চাই। এত জিনিষ কি একঘরে ধরে? আরে মশাই, তাই বলে বাপের আমলের জিনিষ কি ফেলে দেব? কেউ দেয়? বীণা, ভদ্রলোকের জন্য একটু চা টা কর। তোর মা কোথায়, রান্না ঘরে বুঝি?'

চার পাঁচ থেকে দশ বার বছরের মধ্যে গুটি পাঁচেক ছেলে মেয়ে দরজার কাছে উঁকি দিচ্ছিল, গিরীনবাবু ধমক দিলেন, 'এখানে কি, এখানে কি চাস তোরা। যা, একটু বিষ্টুবাবুদের ঘর থেকে ঘুরে আয় গিয়ে।'

বললাম, 'এখানেই থাকুক না!'

'না না গোলমাল করবে। আপনার সঙ্গে নিরালায় দুটো কথা বলব বলেই ডেকে আনলাম। বীণা, মা, কই একটু চায়ের বন্দোবস্ত করলে না?'

ইঙ্গিত বুঝতে পেরেও বীণা কিন্তু ঘর থেকে নড়ল না।

মেঝের উপর আলমারিটায় একটু ঠেস দিয়ে বসে বলল, 'চায়ের কথা মঞ্জুকে বলে এসেছি বাবা, সে-ই আনছে। জানো ইনি একজন লেখক। আমাদের টেলিফোনের অফিসে কি হয় না হয় জানতে এসেছেন।'

গিরীনবাবু বললেন, 'ও তাই বলুন। কাগজে সব লিখবেন বুঝি? লিখুন, ভালো করে আচ্ছা করে চুটিয়ে লিখুন [illegible]। [illegible]াই খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে গেল মেয়েগুলোর। পাল পার্বন নেই, ছুটি ছাটা নেই, সপ্তাহে একটা অফ ডে পর্যন্ত পায় না। লিখুন, আপনাদের এসব নিয়ে আন্দোলন করা উচিত।'

বললাম, 'তা তো ঠিকই।'

গিরীনবাবু জোড় আসন করে শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক নয় মশাই কম দুঃখে কি চাকরিতে দিয়েছি মেয়েকে? দু' বছর আগে আমিই কি ভাবতে পারতাম নগেন গুহ ঠাকুরতার নাতনী গিরীন গুহ ঠাকুরতার মেয়ে টেলিফোন অফিসে ঢুকবে। যেখানে কত রকম কত কথা শুনেছি। অবশ্য আজকাল আর সেসব নেই। বেশির ভাগই আমাদের মত বাঙালী গেরস্ত ঘরের মেয়ে। আমি সব খোঁজ খবর নিয়েছি। কই বীণা চা টা।'

বীণা বলল, 'আসছে বাবা, তুমি ব্যস্ত হয়োনা।'

গিরীন বাবু বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা। এসব চা টার পাট আবার মঞ্জুর হাতে। এরই ছোটটি। মাঝখানে ছেলে একটি ছিল, দু'বছর আগে টাইফয়েডে শেষ হয়েছে।'

গিরীনবাবু একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'যাকগে যে যাবার সে যাবে। বীণাই এখন আমার বড় ছেলে। ছেলের চেয়েও বড়ো। উনিশ কুড়ি বছরে ম্যাট্রিক পাশ কোন ছেলের কি সাধ্য ছিল আজকালকার দিনে দেড়শ টাকা রোজগার করে? কেবল যে টাকা আয় করে তাই নয় পাই ফার্দিংটি পর্যন্ত সংসারের জন্য খরচ করে। আজকাল জমাখরচের ভারও ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। ওই সব চালায়। নিজের হাতে থাকলেই খরচ বেশি। চিরকালের অভ্যাস। বাজারে গেলে ভালো মাছটুকু না এনে পারি না, দুটো বেশি তরকারী আনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মার সব পাই ফার্দিং এর হিসাব।

মৃদু হেসে মেয়ের দিকে একটু তাকালেন গিরীন বাবু। বীণা এবার উঠে দাঁড়াল, 'নাঃ এত আলসে হয়েছে মঞ্জুটা। এক কাপ চা করে আনবে তাতে এতক্ষণ লাগে।'

বলতে বলতে বীণা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বললাম, 'আপনি কি করেছেন?'

গিরীনবাবু বললেন, 'কোনদিন চাকরি বাকরি করে খেতে হবে তাকি আর ভেবেছিলাম মশাই? কিন্তু সারা জীবন কাটিয়ে শেষে এসে ঠেকে গেলাম। আজকাল আছি উল্টোডিঙ্গির একটা আড়তে। নাম শুনে থাকতে পারেন। ব্রজমাধব সাহা। চালানী কারবার আছে আলকাতরা, আর কেরোসিনের। আমাদের ওদিকেই বাড়ি।'

'কি করতে হয় ?'

গিরীনবাবু বললেন, 'সব। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ যায় না। কেবল মাইনের বেলাতেই—। যাকগে ওসব দুঃখের কথায় আর কি হবে? আপনাকে যে জন্য বসিয়ে রেখেছি। আচ্ছা মৃন্ময় নন্দী ছেলেটি কেমন? আপনারা একসঙ্গে কাজকর্ম করেন।'

হেসে বললাম, 'সে তো আপনাদেরই ভালো জানবার কথা। আপনাদের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, অনেক উপকার টুপকার করেছে শুনেছি।'

গিরীনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ তা করেছে। তাতো অস্বীকার করিনে। বীণার চাকরি একরকম ওই জোগাড় করে দিয়েছে। কিন্তু চাকরি করে দিয়েছে বলে কি সবই আমাকে সহ্য করতে হবে? যে রক্ষক সেই ভক্ষক? বাপ হয়ে আপনি আমাকে এসব সহ্য করতে বলেন? আমি তা পারব না মশাই, না খেয়ে মরে গেলেও না।'

ব্যাপারটা কি এবার জিজ্ঞেস করলাম। গিরীনবাবু বলবার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় সবই খুলে বললেন। মৃন্ময় আর গিরীন বাবুদের গ্রাম পাশাপাশি। কিন্তু দেশে থাকতে যাতায়াত আলাপ পরিচয় তেমন ছিল না। কায়েত হিসেবে ভাল কায়েত নয় নন্দীরা। দু' পুরুষ আগেও নাকি ঝাড়ু গামছা বইত। কিন্তু এখন দিন কাল বদলে যাওয়ায় সবাই তা ভুলেছে। গিরীন

বাবুও আর সেকথা মনে রাখেন নি। ছেলেটি এম, এ পাশ করেছে, দেখতে শুনতে ভালো, পরোপকারী। ওর সম্বন্ধে আগে খুব ভালো ধারণাই ছিল গিরীনবাবুর। বাসার মেয়েদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে দিয়েছেন। বীণার মা তো মৃন্ময় বলতে অজ্ঞান। বীণাও ওর সঙ্গে অসঙ্কোচে মেলামেশা করে। গিরীনবাবু ভেবেছিলেন, করুক। যখনকার যা যা হাল চাল সেই রকমই তো হবে। কিন্তু গৌরনগর কৃষ্ণপুরের লোকের তো আর কলকাতায় অভাব নেই। তারা এসে গিরীনবাবুকে মৃন্ময় আর বীণার ঘনিষ্ঠতার নিত্য নতুন বিবরণ শোনাতে লাগল। কবে একদিন তারা নাকি একসঙ্গে সাহেব পাড়ার সিনেমা হাউস থেকে ইংরেজী ছবি দেখে ফিরছিল, একসঙ্গে কবে তুজনকে রেস্তরাঁয় ঢুকতে দেখা গেছে, কবে পার্কে দেখা গেছে বসে.গল্প করতে এসব খবর প্রায়ই পেতে লাগলেন গিরীন বাবু। দিন কয়েক ইতস্তত করলেন, ছেলে হিসাবে তো ভালোই মৃন্ময়, আর কোন দিক থেকে তো কোন আপত্তি নেই তাঁর, কেবল বংশটা বড়ই নিচু। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বীণার মা বললেন, 'তুমিও যেমন, সহর বন্দরে আজকাল আবার ওসব কেউ দেখে নাকি। এক জাতের সঙ্গে আজকাল আর এক জাতের কত বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর মৃন্ময় ছোট হোক, বড় হোক জাতে তো কায়েত ছাড়া কেউ বলবে না। তুমি আর দেরি করো না।'

গিরীনবাবু স্ত্রীকেই মৃন্ময়ের কাছে কথাটা পাড়তে বললেন। কিন্তু কতকগুলি ছেলে পুলেই শুধু হয়েছে, বীণার মার লাজুক স্বভাবটি এখনও যায়নি। ছুটো কথা গুছিয়ে বলবে এমন সাধ্য নেই। গিরীনবাবুকেই প্রস্তাবের ভার নিতে হোল। কিন্তু বলবার আগে আরো ছু' তিন দিন চিন্তা করলেন। এবার আর মৃন্ময়দের নিচু বংশের চিন্তা নয় নিজেদের সংসার কিভাবে চলবে সেই চিন্তা। তাঁর নিজের আয়ের চেয়ে মেয়ের আয় বেশি। সংসারের বেশির ভাগ খরচ বীণার টাকায় চলে। কিন্তু স্ত্রী বললেন, 'তাই বলে মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো থেকে তোমাকে খাওয়াবে? পুরুষ হয়ে অতই যদি ভয়, আমাকে নামিয়ে দাও চাকরিতে। কিন্তু মেয়ের বিয়ে তুমি না দিয়ে পারবে না।'

গিরীন বাবুরও জেদ বেড়ে গেল। যাঃ শালা। না হয় ডাল ভাত খেয়ে থাকব, না হয় একবেলা খাব। তবু বীণা তো সুখী হোক। ওতো সুখে শান্তিতে ঘর গেরস্থালী করুক। খেটে খেটে যা হাল হয়েছে মেয়েটার।

মনস্থির করতে পেরে ভারি আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন গিরীনবাবু। যেন এমন ত্যাগ পৃথিবীতে আর কেউ কোন দিন করেনি। এতো কন্যাদান নয়, দধিচীর অস্থিদানের চাইতেও বড়। বুকটা ফুলে উঠল গিরীনবাবুর, শত হলেও গুহ ঠাকুরতা বংশের ছেলে। অবস্থার বিপাকে পড়ে ছোট

কায়েত নন্দীদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে উদ্যত হলেও উঁচু গুহ ঠাকুরতা বংশের রক্তের মহিমা যাবে কোথায়।

তারপর সেঁদিন মৃন্ময়কে নিমন্ত্রণ করলেন দুপুরে খেতে। বীণা কিছুতেই শুনল না, অফিসে চলে গেল। গিরীন বাবু টাকা পাঁচেক খরচ করলেন বাজারের জন্যে। দুরকমের মাছ আনলেন, দই মিষ্টি আনলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর শেষে কথাটা পাড়লেন মৃন্ময়ের কাছে।

'ওসব বংশ টংশ আমি মানিনে মৃন্ময়। কায়েতের আবার ছোট বড় কি। তা ছাড়া দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষঃ এই কথাই সার কথা। কি বল।'

মৃন্ময় ঘাড় নাড়ল, 'তা তো ঠিকই।'

গিরীন বাবু বললেন, 'তোমার হাতে পড়ে বীণা সুখী হবে এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি বলি কি পাঁচজনে যখন পাঁচ কথা বলতে সুরু করেছে, তখন সামনের বৈশাখেই কাজটা চুকিয়ে ফেলা যাক। হাঁড়ির খবরতো তোমার জানতে বাকি নেই। দিতে থুতে কিছুই পারব না, শুধু শাঁখা আর সিঁদুর—'

কিন্তু মৃন্ময় যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'এসব বলছেন কি আপনি?'

এক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকে গিরীনবাবু বললেন, 'বলছি কি, মানে?'

মৃন্ময় বলল, 'বিয়ের কথা উঠল কিসে ? কার বিয়ের কথা বলছেন আপনি ?'

গিরীনবাবু আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, মুখও ঠিক রাখতে পারলেন না, বলে উঠলেন 'হারামজাদা নফরের বেটা নফর। তুমি ভেবেছ কি। বিয়ে থা করবে না, দায়িত্ব নেবে না, অমনি অমনি সর্বনাশ করবে মেয়েটার ? যেমন বংশে জন্ম, তেমন তো প্রবৃত্তি হবে। বেরোও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।'

মৃন্ময়ও আস্তিন গুটিয়েছিল, 'খবরদার মুখ খারাপ করবেন না। বীণাকে আমি স্নেহ করি, আর নেহাতই আপনি তার বাবা, না হলে ঘুষির চোটে দু' পাটির একটি দাঁতও আপনার বাকি থাকত না।'

মৃন্ময় বেরিয়ে যেতে যেতে ফের বলে গিয়েছিল, 'অনেক দেখেছি, আপনার মত নেমকহারাম আর দুটি নেই।'

এ কথার পর গিরীনবাবু তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন মৃন্ময়কে। বীণার মা এসে স্বামীর হাত টেনে না ধরলে সেদিনই একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যেত।

তারপর থেকে আর কারো মুখ দেখাদেখি নেই।

চা আর খাবার নিয়ে ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। চেহারা ভালো, রঙটাও বেশ ফর্সা।

গিরীনবাবু বললেন, 'এইটি মেজো মঞ্জু। ওকে আগেই বিয়ে দেব। বার বার আর ফ্যাসাদ বাড়াতে চাই না। দেখবেন তো একটি ছেলে। ওকে কারো অপছন্দ হবে না। যে দেখবে সেই নেবে। এবার সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বীণা ঘরে ঢুকল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোমরা তাহলে কথা বল বাবা, আমি একটু ঘুরে আসি।'

গিরীনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এই রাত্রে আবার কোথায় ঘুরে আসতে যাবি। বিন্দুমাত্র যদি আত্মসম্মান বোধ থাকে—'

বীণা একটু হাসল, আত্মসম্মান বোধ এখনো দু' এক বিন্দু আছে বাবা। তুমি যা ভাবছ তা নয়, তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া শেষ হয়ে গেছে।

'তবে কোথায় যাচ্ছিস ?'

বীণা বলল, 'কমলাদের ওখানে। কদিন থেকে জ্বরে ভুগছে। দেখে আসি গিয়ে। মাইনের টাকা সব আগেই গেছে। ওষুধ পথ্য নাকি জুটছে না। দেখি গিয়ে কি ব্যবস্থা করল।

গিরীনবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, 'ব্যবস্থা আর তারা করবে কি ব্যবস্থা করবার জন্যে তো তুমিই আছ। আজও আবার টাকা নিয়ে যাচ্ছিস, না ?'

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ।

গিরীনবাবু বললেন, 'কত টাকা ?'

'দশ'।

গিরীনবাবু চীৎকার করে উঠলেন, 'দশ টাকা ? মাসের শেষে দশ দশটা টাকা তুই ওদের দিয়ে দিচ্ছিস ; আর সংসার কি করে চলবে ?

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা।'

গিরীনবাবু বললেন, না তা ভাবতে হবে কেন ? যেন একা তোমার ওই কটি টাকাতেই সংসার চলে। যত ভাবনা যেন তুমিই ভাব। এই নিয়ে কত টাকা ধার দিলি ওদের ?'

বীণা চুপ করে রইল।

গিরীনবাবু বললেন, 'ভাই বোনের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অত দান ধ্যান চলবে না তোমার। আমি বলছি ও টাকা তুমি দিতে পারবে না।

বীণা রূঢ় কণ্ঠে বলল, আমার রোজগার করা টাকা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দেব। তাতে কেউ যেন কোন কথা বলতে না আসে।

গিরীনবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

মঞ্জু বলল, 'দিদি তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি হবে না ? বাবাকে ওসব কথা বলে ?'

কিন্তু বীণা কোন দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম, 'আজ চলি গিরীন বাবু।'

গিরীন বাবু কোন জবাব দিলেন না।

সিঁড়িতে পা দিতে না দিতে পিছন থেকে কে বলল, 'পান নিলেন না?'

ভারি মিষ্টি গলা।

ফিরে তাকিয়ে দেখি মঞ্জু।

বললাম, পান তো আমি খাইনে।'

'ও খান না। কোন দিনই খান না?

মঞ্জু একটু হাসল। রক্তাভ পাতলা ঠোঁট, সুন্দর ঝকঝকে ছোট ছোট দাঁত।

বললাম, 'কোন কোন দিন খাই।'

পান নিলাম ওর হাত থেকে। মনে মনে ভাবলাম, গিরীন বাবু বললে মৃন্ময় হয়ত মঞ্জুকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যেত। নারীর সৌন্দর্যের ওপর পুরুষের পক্ষপাত চিরকালের। বীণার যা চেহারা, আর যা স্বাস্থ্য তাতে মৃন্ময়কে খুব দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু ভালোবাসায় নাকি সব অভাব মেটে?

গলির মোড়ে বীণার সঙ্গে দেখা হোল। ও অপেক্ষা করছিল।

একটু ইতস্তত করে বললাম, দেখুন, আজকে আমার বোধ হয় না আসাই ভালো ছিল। এসব দেখবার শুনবার আমার ইচ্ছা ছিল না।

বীণা অদ্ভুত একটু হাসল, 'ভালোই তো হোল। না দেখলে না শুনলে লিখবেন কি করে।'

বললাম, 'দেখুন, লেখাটা বড় অদ্ভুত জিনিস। সব সময় যা দেখা যায় তা লেখা যায় না।'

বীণা বলল, 'লেখককে তা হলে বুঝি সময় সময় সুবিধামত চোখ কান বুজে থাকতে হয়?'

ওর ঠাট্টাটা হজম করে নিয়ে হেসে বললাম, 'হ্যাঁ তাও দরকার হয় কোন কোন সময়। কোথায় চললেন?'

বীণা একটু ইতস্তত করে বলল, এই কাছেই, শ্রীনাথ দাস লেনে। আপনি খুব অবাক হয়ে গেছেন না?

'কেন?'

বীণা বলল, 'বাবার মুখের ওপর নিজের রোজগারের গর্ব করে এলাম বলে। কিন্তু জানেন সব সময় ধৈর্য থাকে না। মেজাজ ঠিক রাখা মুস্‌কিল হয়। এত হীন এত স্বার্থপর হতে পারে মানুষ যে দেখে, ভয় লাগে। জানেন, এই কমলা কত সময় কত উপকার করেছে আমার। আর ও আজ অসুখে পড়েছে, ওর দাদার চাকরি নেই, এসময় ওকে যদি না দেখি দু'পাঁচ টাকা দরকার মত যদি না দিতে পারি সেটাই কি খুব ভালো দেখায়?'

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে রাস্তা পার হলাম।

বীণা বলতে লাগল, 'অবশ্য পাঁচ টাকাই হোক, দশ টাকাই হোক এভাবে মাসে মাসে তুলে দিতে ভারি কষ্ট হয়। বিশেষ করে যখন বুঝতে পারি এ টাকা শোধ

দিতে ওর অনেক দেরী হবে ; হয়ত কোন দিনই দিয়ে উঠতে পারবে না. তখন একেক সময় ইচ্ছা হয় আর দেবনা। তবু না দিয়ে পারা যায় না। কিন্তু বাবার ধারণা কি জানেন, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় আমি দু'হাতে সব বিলিয়ে দিচ্ছি। বীণা অদ্ভুত একটু হাসল তারপর বলল, 'আচ্ছা নমস্কার। আসবেন কিন্তু আর একদিন।'

একটা বাড়ির আড়ালে বীণা অদৃশ্য হলে আমি ফিরে এসে ট্রাম ধরলাম।

সত্যি বলতে কি বীণা গুহ ঠাকুরতাকে নিয়ে একটি প্রেমের গল্পই মনে মনে ভাজতে সুরু করেছিলাম। বীণার টেলিফোন অফিসের যন্ত্রপাতির খুটিনাটি আমার খুব কাজে আসবেনা। তা আমি প্রায় প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। সবাই তো আর সব জিনিস কাজে লাগাতে পারে না। অপারেটরদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনে আমার মনে যে সহানুভূতি আসেনি তা নয়, কিন্তু সব অনুভূতিই কি সব সময় গল্পের উপাদান হয়ে ওঠে? বীণার সেই ডায়েরিতে নাম সই করবার ভঙ্গিটি আমার চোখে লেগেছিল, মৃন্ময়ের সঙ্গে ওর আলাপের বিশেষ ধরণটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চলতি ধারণা অনুযায়ী তাকে ঠিক প্রেমালাপ বলা যায় না, কিন্তু আলাপের মধ্যে ওদের পরস্পরের প্রীতি আর প্রসন্নতা তো সবটুকু গোপন থাকেনি। ভেবেছিলাম তাই নিয়েই

লিখব। মৃন্ময় আর বীণাকে নিয়ে প্রেমের গল্পই লিখব একটি। প্রেমের গল্প হলেও সে গল্প পুরোন গল্প হবেনা এ বিশ্বাস আমার ছিল। কারণ প্রেম যত পুরোনই হোক, মানুষ নতুন। যদি মৃন্ময় আর বীণাকে স্বকীয়তা দিতে পারি, যদি একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরী করে নিতে পারি ওদের জন্যে, তাহলে প্রেমকে ভয় কিসের ?

কিন্তু আজকের ঘটনায় প্রেমের গল্প লেখায় উৎসাহটা ক্ষীণ হয়ে এল। মৃন্ময় আর গিরীনবাবুর মধ্যে যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল সে কথা শুনে না, বীণা যে নিজের মুখে বলল প্রেমের গল্পটাই আগাগোড়া ওর কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে সেই কথা স্মরণ করে। অবশ্য মুখের কথার সঙ্গে যে ওর মনের কথার অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে তা আমি বিশ্বাস করিনে। তা ছাড়া ব্যর্থ প্রেম নিয়েও অব্যর্থ গল্প হতে পারে। কিন্তু দেখা ঘটনা নিয়ে লিখতে যাওয়ার বিপদ এই, যা দেখি তাই লিখতে ইচ্ছা করে। চোখ দুটো কলমের ডগায় গিয়ে বসতে চায়, অথচ স্থির হয়ে থাকতে পারেনা। মৃন্ময়ের সঙ্গে বীণাদের খানিকটা বিরোধ হয়ে গেল। কই তা নিয়ে ওকে তো তেমন বিচলিত হ'তে দেখলাম না, তেমন একটা দুঃখ ক্ষোভ কি আফশোষ যে ওর হয়েছে তা তো মনে হোল না। বরং ও চলল কোন এক রুগ্না বান্ধবীকে সাহায্য করতে। তাই নিয়ে বাপের

সঙ্গে রূঢ় ভাষায় ঝগড়া করল, কটু ভাষায় একজন অর্দ্ধপরিচিত লোকের কাছে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র-মনা বলে নিন্দা করল বাপকে। ডায়েরিতে একজন স্মিতমুখীর নাম সই করা দেখতে দেখতে যে মেয়েটি আমার কল্পনায় এসেছিল, তার রূপ না থাক লাবণ্য আছে, নারীসুলভ নমনীয়তা আছে, দারিদ্র্য সত্বেও শিক্ষা আর রুচির আভিজাত্য আছে। অন্যলোকের সামনে সে নির্মমভাবে বাপের সমালোচনা করে না। কিন্তু আজ কি হোল, সুরযন্ত্রের একটি সূক্ষ্ম, সুকোমল তার যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। আবার নতুন করে বাঁধতে হবে।

দিন কয়েক বাদে রাত দশটায় ডিউটি দিয়ে ফিরছিলাম, দেখি মৃন্ময় রিপোর্টারদের গাড়ি নিয়ে কোথায় চলেছে। হিন্দুস্থানী ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ সঙ্গে নেই। আমাকে দেখে গাড়ী থামিয়ে বলল, 'আসুন।'

বললাম, 'গাড়িতে আমি আর কতটুকু যাব। আপনি চলেছেন কোথায় ?'

সহরে টুকটাক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলছে তখন।

মৃন্ময় বলল, 'রাজাবাজারের এদিকে বেশ একটু গোলমাল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ। বলে কয়ে গাড়ি একখানা জোগাড় করলাম, এলাকাটা পার করে রেখে

আসবে। আপনাদের পাড়ায় তো কোনরকম কিছু হয়নি।'

মৃন্ময়ের পাশে বসতে বসতে বললাম, 'না, ওদিকে কোন গোলমাল নেই।'

মৃন্ময় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'যত গোলমাল কেবল আমাদের বেলায়।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'গিয়েছিলেন নাকি সেদিন?'

'হ্যাঁ।'

'দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়টা হোল সকলের সঙ্গে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, গিরীন বাবুর সঙ্গেও আলাপ হোল।'

আলাপের গোড়ার দিকে যে বিপদে পড়েছিলাম সে কথাটাও গোপন করলাম না।

শুনে মৃন্ময় বলল, 'হবেই, যেমন অভদ্র, তেমনি অকৃতজ্ঞ। মাত্রা জ্ঞান বলে কোন জিনিস ভদ্রলোকের নেই, কাকে কি বলতে হয়, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা যায়, তা কোন কালে শেখেনি। তবে শিক্ষা সে দিন আমি ত [illegible] লে দিয়ে দিতাম।'

বললাম, 'তাও শুনেছি।'

মৃন্ময় এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শুনেছেন? ও।'

ফের একটু কাল চুপ করে রইল মৃন্ময়, তারপর

বলল, 'দেখুন, প্রাইভেসি বলে যে একটা কথা আছে, আমার মনে হয়, আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তা একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। আমাদের কিছুই আর আড়াল করবার নেই। শক্তি নেই কিছু চেপে রাখবার, কিছু গোপন করবার। সব রকম পর্দা আমরা তুলে ফেলে বেঁচেছি।'

বললাম. 'উপায় কি, যাদের পরবার কাপড় জোটে না তাদের দরজা জানালা ঢাকবার পর্দা জুটবে কোত্থেকে।'

মৃন্ময় অধীর হয়ে বলল, 'আপনারা কবি মানুষ, নানারকম অলঙ্কার দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন, আমাদের ও সব আসে না। কিন্তু যাই বলুন আমি হলে তো এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অমন ঢাক ঢোল পিটিয়ে বেড়াতে পারতাম না। উনি বুঝি ভেবেছেন এরকম একটা কলঙ্ক রটিয়ে রটিয়ে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবেন ? মৃন্ময় নন্দী তেমন কাঁচা ছেলে নয়। জানেন, এই নিয়ে বাবাকে পর্যন্ত উনি বলতে গিয়েছিলেন। বাবাও আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছেন।'

'কি বলছেন তিনি।'

মৃন্ময় বলল, 'বলবেন আবার কি, বাবা তো আর গিরীন বাবুর মত অমন রগচটা মানুষ নয়। তিনি মুখ খারাপ করতেও জানেন না। বেশ রসিয়ে রসিয়ে ভদ্রভাবেই বলে দিলেন, 'গুমশাই, মৃন্ময় কি ভালোবাসবার আর

মেয়ে পেল না? আমি তো আপনার মেয়েকে না দেখিছি তা নয়।'

কেন যেন অত্যন্ত আহত হলাম। মৃন্ময়ের কাছে ঠিক এ ধরণের কথা প্রত্যাশা করিনি। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু মৃন্ময়বাবু, আপনার বাবার চোখ আর আপনার চোখ কি এক?'

মৃন্ময় একটু চুপ করে রইল; তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হয়ত ঠিক এক নয়। কিন্তু একজনের চোখও তো চিরদিন এক রকম থাকে না। অবস্থা ভেদে বদলায়।'

অবস্থার বিভিন্নতা কি করে এল সে সম্বন্ধে কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করে বসলাম। মৃন্ময় প্রাইভেসি রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করল। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে আমার কষ্ট হোলনা। একথাও মনে হোল, সেটুকু যাতে বুঝতে পারি সে সম্বন্ধে মৃন্ময়ের আগ্রহ কম নয়।

দেশে থাকতে বীণার সঙ্গে মোটেই আলাপ ছিল না মৃন্ময়ের। গিরীন বাবুর সঙ্গে কদাচিৎ হাটে বাজারে দু' একবার দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়েছে। বংশের গুমর গিরীনবাবুর তখন খুবই ছিল, জাতে কায়স্থ হয়েও মৃন্ময় নন্দীরা বিয়ে অন্নপ্রাশনে সামাজিক ভাবে নিমন্ত্রণ পেতনা। মৃন্ময়ের বাবা মনোমোহন নন্দী ছিলেন আলাদা দলের লোক। দলাদলিটা যে মেটেনি তার মূলে ছিলেন গিরীন

গুহ ঠাকুরতা। কিন্তু ষ্টীমারে স্ত্রীপুত্র কন্যা আর লটবহর নিয়ে ভদ্রলোক যখন ভিড়ের মধ্যে জায়গা না পেয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন, মৃন্ময় তাঁকে সাহায্য করতে নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই এগিয়ে গিয়েছিল। গিরীনবাবুও সাদরে সস্নেহে তাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'এসো বাবা এসো।' গ্রামের দলাদলিটা যে গিরীনবাবু ষ্টীমার পর্যন্ত নিয়ে আসেন নি তা লক্ষ্য করে মৃন্ময়ও খুসি হয়েছিল। খুলনায় এসে গাড়ি ফেল করায় একই হোটেলে খেয়েছিল সবাই মিলে। তারপর, গাড়ির কামরায় ঠেলা ঠেলি করে ঢুকে পড়েছিল সবাই। কোন রকমে সপরিবারে গিরীন বাবুকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে মৃন্ময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু গিরীনবাবুই তাকে টেনে বসালেন, 'এই বীণা, তুই একটু ওদিক্ চেপে বসতো। মৃন্ময় তুমি মাঝখানে এসে বস। মালপত্র টানাটানি করতে কি কম মেহনৎ হয়েছে। কি রকম ঘেমে গেছে দেখ। এস, সবাই যখন আমরা রয়াল ক্লাসের যাত্রী, কষ্ট করা ছাড়া আর উপায় কি?'

ঘোমটা-পরা বীণার মা বোঁচকার ভিতর থেকে একখানা তাল পাতার পাখা বীণার হাতে বের করে দিয়েছিলেন। বীণাও বিনা বাক্যে বাতাস করতে সুরু করেছিল। একটু বাদে মৃন্ময় বলেছিল, 'থাক থাক, বাতাসের দরকার নেই।' কিন্তু বীণা মুখ না খুললেও পাখা বন্ধ করেনি।

তারপর অনেক রাত্রে গাড়ীর সবাই যখন বসে বসে ঢুলছে, বড় একটা ট্রাঙ্কে ঠেস দিয়ে গিরীনবাবু নিজেও নাক ডাকতে স্থুরু করেছেন, তখন হাতের পাখা শুদ্ধ বীণার মাথাটা হঠাৎ একবার মৃন্ময়ের কোলের ওপর ঢুলে পড়ল। মৃন্ময় একটু নড়ে বসতেই বীণা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হয়ে মাথা তুলে নিয়েছিল। বীণার মাও তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, 'এদিকে আয়, এখানে এখন জায়গা হয়েছে।' আর বীণাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু মৃন্ময়ের আর ঘুম হয়নি, মাঝে একটু তন্দ্রা মাত্রও আসেনি। একবার মনে হয়েছিল বেশ চুল আছে তো মেয়েটির মাথায়, খোঁপা বাঁধবার ভঙ্গিটি তো ভারি সুন্দর। সাধারণত নারকেলের তেলের গন্ধ মৃন্ময়ের ভালো লাগেনা, কিন্তু সেদিন লেগেছিল। মাঝে মাঝে অমন লাগে।

বাক্যালাপ হয়নি, তবু আলাপের স্থুরু সেইখানেই। তারপর শ্যামবাজারে বীণার মামার বাসায় দেখা করতে গিয়েছিল মৃন্ময়। গিরীনবাবুই ঠিকানা দিয়েছিলেন। কথা ছিল মামার বাসাতেই বীণারা একখানা ঘর পাবে। কিন্তু মামীমার ভাইও সপরিবারে সে বাসায় উঠে এসেছেন। তাই গিরিনবাবুকে নতুন বাসা খুঁজে নিতে হোল। কিন্তু ঘর পাওয়া তো কলকাতায় আজ কাল সহজ নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঞ্ছারাম অক্রুর লেনের বাসা মৃন্ময় ওদের ঠিক করে

দেয়। আরো অনেক আত্মীয় স্বজন প্রার্থী ছিল ঘরের। কিন্তু মৃন্ময় তাদের দাবী উপেক্ষা করেছে। শুধু তাই নয় বীণার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ব্যাপারেও সাহায্য করেছে মৃন্ময়। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বীণা যে চাকুরি পেয়েছে তাও মৃন্ময়েরই চেষ্টায়।

'অথচ সেই আমার সঙ্গেই কি ব্যবহারটা ওরা করল দেখলেন?' মৃন্ময় আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, 'ওরা কেন বলছেন। খারাপ ব্যবহার গিরীন-বাবুই না হয় করেছেন, বীণার আর দোষ কি।'

মৃন্ময় বলল, 'সব সমান মশাই, সব সমান। দোষ আবার নেই? সাধারণ একটু চক্ষুলজ্জা যদি থাকত তাহলে বীণা আসতে পারে সেই ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে?'

'ঝগড়া?'

মৃন্ময় বলল, 'ঝগড়া মানে, রীতিমত কেলেঙ্কারী কাণ্ড। আমি নাকি ওর বাপকে অপমান করেছি। আর ওর বাবা যে আমাদের দুজনকে অপমান করেছে সে কথার ধার দিয়েও গেলনা ও।'

বললাম, 'আপনি বললেন না ওকে।'

মৃন্ময় বলল, 'বললাম বই কি। কিন্তু বীণা সোজা স্পষ্ট ভাষায় আমার মুখের ওপর বলে বসল, তুমি তো জান তার সব কথা মিথ্যা নয়—।'

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময় আমার দিকে চেয়ে বলল, 'মেয়েরা এমন নির্লজ্জও হতে পারে।'

বীণার নির্লজ্জতায় মৃন্ময় একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রয়েছিল। তারপর সেও নির্লজ্জের মতই বলেছিল, 'না, মিথ্যা নয়। কিন্তু ভেবে দেখ তার জন্য দায়ী কি কেবল আমি?'

বীণা বলেছিল, 'কে কতটুকু দায়ী তা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা, কিন্তু বাবাকে অমন করে অপমান না করলেও চলত।'

মৃন্ময় জবাব দিয়েছিল, 'তিনি নিজে যেচে যদি অপমানের কারণ ঘটান আমি কি করতে পারি। বিয়ের কথা পাড়বার কি দরকার ছিল তাঁর। সব সময় কি মানুষের মন ওসব কথার জন্য তৈরী থাকে।'

বীণা ব্যঙ্গ করে উঠেছিল, 'থাকে না বুঝি?'

মৃন্ময় রাগ সামলাতে পারেনি, 'থাকেইতো না। তাহ'লে ব্যাপারটা সব আগাগোড়া সাজানো। সেই ষ্টীমারে দেখা হওয়ার দিন থেকেই বাপ মেয়ে মতলব পাকিয়ে রেখেছিলে।'

বীণা বলছিল, 'সেইরকমই যদি মনে কর তাহলে তাই। তোমার মতলবটাও যে কতখানি সাধু তাও তো বেশ দেখা যাচ্ছে।'

মৃন্ময় বলেছিল, 'বটে! কোর্টে গিয়ে আরো পাঁচখানা কি কি সব বানিয়ে বলবে বাপের সঙ্গে পরামর্শ করে রেখেছ তো? সব মিলিয়ে [illegible] দশ বার [illegible] কিন্তু

কাউকে মোটেই আইনে আটকানো যায় না। বড় জোর বিশ পঁচিশ টাকা ফাইন হতে পারে।'

বীণা অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'বেশ তো যাতে আটকানো যায়, যাতে জেল জরিমানা দুই হয় সেই চেষ্টাই দেখব।'

মৃন্ময় জবাব দিয়েছিল, 'তাও তোমরা পার। তোমাদের অসাধ্য কোন কাজ নেই।'

বীণা চলে যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল, 'সে কথা যেন মনে থাকে।'

শুনতে শুনতে সেই কারফিউর দিনেও আমার নামবার জায়গা ছাড়িয়ে আমি মৃন্ময়ের সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। মৃন্ময় ষষ্ঠীতলার মোড়ে নামতে নামতে বলেছিল, 'ভয় নেই অফিসের গাড়ি ফেরার পথে আপনাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাবে, কিন্তু কোন বাঙালী মেয়ে যে এমন হতে পারে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। দেখতে ট্যাসের মত, মেশেও তাদের সঙ্গে, চাল, চলন, রুচি, প্রবৃত্তিও সেইরকমই হয়েছে।'

মৃন্ময়কে অবশ্য খুব দোষ দেওয়া যায় না। বিয়ে সম্বন্ধে এর আগেও এক একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি। তখন অবশ্য বীণার সঙ্গে আলাপ হয়নি। মৃন্ময়ের ধারণা, এই সামান্য আয়ে বিয়ে করা যায় না।

যতদিন মানুষ বিয়ে না করে ততদিন তার দায়িত্ব কম। যেখানে সেখানে থাকতে পারে, যেখানে সেখানে আড্ডা দিতে পারে। কিন্তু বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গে সে পুরোপুরি সামাজিক পারিবারিক মানুষ। কেবল অতীত বর্তমানের নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরের কথাও তাকে ভাবতে হয়। মৃন্ময় মনে করে দেড়শ টাকায় সে ভাবনার কূল কিনারা মেলেনা। তাছাড়া সে তো একা নয়। বাপ মা আছে, একটি ভাগ্নী আছে, বিধবা সন্তানহীনা একজন কাকীমার দায়িত্বও নিতে হয়েছে মৃন্ময়কে। বলেছিলাম, 'দেখে শুনে একজন চাকুরী-বতীকে বিয়ে করুন, দুজনে মিলে চার হাতে রোজগার করবেন।'

মৃন্ময় জবাব দিয়েছিল, 'না মশাই তা পারবনা। বউও যদি চাকরিতে বের হয়, সারাদিন বাইরে থাকে, তাহলে ঘর গুছোয় কে। এদিক থেকে আমি একটু সেকেলে। আমরা কেরাণীগিরি করি ক্ষতি নেই। কিন্তু ঘরে যে আসবে সে রাণী হয়ে থাকবে। দেখতে মোটামুটি সুন্দরী হবে। যাতে শাঁখা সিন্দুর-পরলে বেশ মানায়। জানেন তো, সুন্দর না হলে সিন্দুর মানায় না। বউ সম্বন্ধে আমার ভারি খুঁৎখুঁতি আছে।'

এত খুঁৎখুঁতি থাকা সত্বেও বীণার মত রূপহীনা মেয়ের সঙ্গে মৃন্ময়ের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কি ক'রে ভেবে বিস্মিত হলাম। হয়ত সাধারণ পরোপকার প্রবৃত্তিই ছিল এই

মেলামেশার ভিত্তি। আর বীণার সুরু হয়েছিল কৃতজ্ঞতায়। তারপর দীর্ঘ দিনের সাহচর্যে যদি একটু রকমফের হয়েইথাকে, যদি কোন বর্ষণ-মুখর বিকালে, কি জ্যোৎস্না-প্লাবিত সন্ধ্যায় খানিকক্ষণের জন্য মৃন্ময় ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলেই নেয়, তাকে ঠিক পাণিগ্রহণের ভূমিকা বলে ভাবা যায় না। অন্ততঃ মৃন্ময় ভাবতে পারেনি। হয় তো বিয়ের কথায় তাই সে অমন করে চমকে উঠেছিল। গিরীনবাবু যদি আরও সময় দিতেন, যদি আরও তৈরী হ'তে দিতেন মৃন্ময়কে, যদি নিজে কিছু না বলতেন, তাহলে মৃন্ময়ই হয়ত একদিন কথা না বলে পারত না। গিরীনবাবু তাড়া-হুড়ো ক'রে কুম্ভকর্ণের কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে ফেলেছেন। সেই ঘুমে স্বপ্নের রঙ ভালো ক'রে লাগবার অবকাশ দেন নি।

তবু বীণা আর মৃন্ময়ের ঝগড়ার কুৎসিত বিবরণটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলাম না। বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয় তাগিদে মাঝে মাঝে বীণাকে নিয়ে যতবার একটা গল্প খাড়া করতে গেলাম ততবারই শ্রম পণ্ড হোল। শেষ পর্যন্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বীণা আর মৃন্ময়ের ওপরই। ওদের সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা বিদ্বেষ বোধ করতে করতে হঠাৎ ওদের ভুলে গিয়ে স্বস্তি পেলাম। একটা থীম বা

প্লটকে ভুলে যেতে না পারলে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মন থেকে তাড়াতে না পারলে অন্য গল্প লেখা তো দূরের কথা অন্য কোন কাজ করাই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

বোধ হয় ছ'সাত মাস পরেই হবে। সকালের সিফটে ডিউটি দিতে এসেছি। অফিসের পরিবেশ দেখে মন খুব প্রসন্ন হোলনা। টেবিলের ওপর রাত্রে আসা নিউজগুলো অগো-ছালো ভাবে রয়েছে। ওগুলি ঠিক ক'রে কাজ আরম্ভ করতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগবে। যে কজন সহকর্মীর নাইট ডিউটি ছিল তাঁদের দুজন এখনো লুঙ্গি পরে মাথার তলায় ডিকসনারী গুঁজে হলের মাঝখানে পাশাপাশি দুটো টেবিলে টান হয়ে পড়ে নাক ডাকছেন। ঝাড়ুদারের ঘর ঝাঁট দেওয়া তখনো হয়নি। উল্টো দিক থেকে ধূলো আসছে উড়ে। নাক তো রুমালে ঢাকলাম, সদ্য ইস্ত্রী ভাঙা কাপড় ঢাকি কিসে। বাইরের বারান্দায় সরে গিয়ে দাঁড়াব, হঠাৎ ফোনটা ক্রীং ক্রীং ক'রে উঠল। এই সকাল বেলায় কে আবার জ্বালাতে এল। বিরক্তির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরলাম; 'হ্যালো, কাকে চাই ?'

বলা বাহুল্য ততক্ষণে মনের সমস্ত অপ্রসন্নতা কণ্ঠে এসে ভর করেছে।

কিন্তু আশ্চর্য মিষ্টি মেয়েলি গলায় নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে ভারি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, 'আমিই বলছি বলুন।'

'ও আপনিই। কিন্তু আপনার গলা অমন বদলে গেল কি ক'রে? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন নাকি?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'মাপ করবেন—ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি কে?'

রিসিভারের ভিতর থেকে একটু হাসির আভাস শুনতে পেলাম, 'বলেন কি, চিনতে পারছেন না? কিন্তু আমার গলা তো তেমনই আছে। একটুও বদলেছে বলে মনে হয় না। বীণা, বীণা গুহ ঠাকুরতা, এবার চিনলেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তারপর কি খবর আপনার। কেমন আছেন?'

'ভালোই, আপনি?'

বললাম, 'কেটে যাচ্ছে একরকম।'

'কোথায় কাটছে? অফিসে না অফিসের বাইরে।'

'কেন বলুন তো?'

'এই নিয়ে তিন দিন ফোন করলাম আপনাকে, কিছুতেই পাওয়া যায় না। আজও তো বহু কষ্টে পেলাম। প্রায় ধমক দিয়েই তাড়াচ্ছিলেন আর কি। যাকগে। শুনুন। একটা কাজের জন্যই আপনাকে এত ক'রে খুঁজছি।'

'কি কাজ বলুন।'

'আমাদের ফোন অফিসের কয়েকটি মেয়েতে মিলে একটা জলসার ব্যবস্থা করেছি। নাচ গান দুই-ই থাকবে। বাইরের নাম করা আর্টিষ্টদেরই আনব। খবরটা যাতে আপনাদের

কাগজে একটু ভালো জায়গায় যায় আর তাড়াতাড়ি বেরোয়, আপনাকে সেটা ক'রে দিতে হবে।'

বললাম, 'বেশ তো, দেবেন পাঠিয়ে।'

'দেব। আর কিছু টিকেট বিক্রির ভারও আপনার ওপর দিতে চাই। আপনি তো একখানা নেবেনই। আপনার কলীগদের মধ্যেও—'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলাম না। একটু ইতস্তত করতে লাগলাম।

বীণা বলল, 'আপনি দয়া ক'রে ওঁদের একটু বুঝিয়ে বললেই কিছু টিকেট নিশ্চয়ই বিক্রি হবে। অন্ততঃ চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি। খরচা টরচা বাদে যা থাকবে তা আমাদের একটি ফোন অপারেটারের চিকিৎসা আর তার দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের কাজে লাগবে।'

বললাম, 'ও।'

বীণা বলল, 'আপনি আমাদের নিয়ে গল্প লিখতে চেয়েছিলেন। একটা প্লট দিচ্ছি আপনাকে। লিখবেন?'

'বলুন।'

'তার কথা আপনাকে একবার বলেওছি। সেই যে কমলা আমাদের সঙ্গে কাজ করত। এখন থাইসিসে ভুগছে। তখন থেকেই আমাদের একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল। এখন আর সন্দেহটা রোগ সম্বন্ধে নয় জীবন সম্বন্ধে। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চেষ্টা ক'রে দেখতেই হবে।'

বললাম, 'সত্যিই ভারি দুঃখের কথা। ওঁদের বাড়ীর অবস্থা কেমন ?'

ফোনের ওপার থেকে আর একটু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। এ হাসি মিষ্টি নয়।

'বাড়ীর অবস্থা চমৎকার। বড় ভাই বেকার। ছোট ভাই সিকিউরিটি প্রিজনার। বাড়ীতে বুড়ো বাপ-মা আছেন। সংসারে বল্‌তে গেলে কমলার চাকরীই ছিল সম্বল। তার তো এই দশা। প্লটটা কেমন ?'

আমি কোন কথা বললাম না।

'পারেন ত লিখুন কমলাকে নিয়ে। আপনি আমাদের নিয়ে লিখতে চেয়েছিলেন ! ওকে নিয়ে লিখলেই আমাদের অনেককে নিয়ে লেখা হবে। অনেকের গল্পই তো প্রায় তাই, একটু উনিশ আর বিশ। লিখবেন তো ?'

বললাম, 'দেখব চেষ্টা করে।'

'তাহলে কিছু টিকেট আপনার কাছে কিন্তু পাঠাচ্ছি। আর খবরটা যেন ঠিক মত বেরোয়। অবশ্যই আসবেন, বুঝলেন ?'

বললাম, 'চেষ্টা করব। মৃন্ময়বাবুও যাচ্ছেন তো ? তাঁকে বলেছেন ?'

খানিকক্ষণ জবাব পেলাম না, তারপর শুনলাম, 'তাঁকে নিমন্ত্রণের ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।' বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোনও ছেড়ে দিল বীণা।

পরদিন বীণা নিজে আসেনি। তার বদলে আর ছুটি মেয়ে এসে টিকেট বই আর কাগজে দেওয়ার জন্য খবরটি আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'বীণাদির এ সময় ডিউটি থাকায় আসতে পারল না।'

চোখে চশমা, ফর্সাপানা দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, 'শোয়ের দিন আপনি কিন্তু অবশ্যই যাবেন। বীণাদি বিশেষভাবে বলে দিয়েছে।'

টিকেট বিক্রির কাজে আমার মোটেই পটুতা নেই। তবু এক টাকা থেকে দশ টাকার পর্যন্ত দামের খান পঁচিশেক টিকেট আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় কেবল বিব্রতই নয়, বেশ একটু বিরক্তও হলাম। খবরটি যথাসময়ে কাগজে বেরুলো, কিন্তু টিকেট পাঁচ সাতখানার বেশী অফিসে বিক্রি হোল না। ভেবেছিলাম অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও মৃন্ময় একখানা টিকেট নেবে। কিন্তু সে তার ধার দিয়েও গেলনা বরং একটু হেসে বলল, 'বেশ বেশ। দাদাও দেখছি দেশের কাজে নামলেন।' তার হাসিতে শ্লেষ ছিল, হয়ত আরও কিছু থাকতে পারে।

অন্য কাজে আটকে পড়ায় শো'তে আমার আর যাওয়া হয়নি। অবিক্রীত টিকেট আর টাকা সেই ফর্সা মেয়েটির মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটির অনুরোধে শো-এর রিভিউও বেশ ফলাও ক'রেই ছেপেছিলাম কাগজে। যে যা পারে। কথায় কথায় মেয়েটি বলেছিল,

'বহু টিকেটই বিক্রি হয়নি, অনেক আর্টিষ্ট আসবেন বলে কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেন নি। লোকসান যদি নাও যায়, কোন রকমে হয়তো খরচটা উঠবে।'

'বীণাদি আবার একটা এ্যাটেম্পট নিতে চায় কিন্তু আমরা আর সাহস পাচ্ছিনে।'

তারপর মাঝে মাঝে ভেবেছি একবার বীণার খোঁজ নেব, একদিন যাব ওদের বাসায়। কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। ওর সঙ্গে তো সামান্য পরিচয়। কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর আত্মীয় স্বজনেরই খোঁজখবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাবে নয়, তাদের সঙ্গে মনের মিল রুচির মিলের অভাবে নয়, সমস্ত কিছুর সদ্ভাব থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয় না। কি এক অদৃশ্য কারণে যাতায়াতের চক্রপথই যেন বদলে যায়। মাসের পর মাস বছরের পর বছর সে সব রাস্তায় আর হাঁটা পড়ে না।

অন্যান্য গল্প লিখতে বসে বীণাকেও মাঝে মাঝে মনে পড়েছে। মৃন্ময় আর ওকে নিয়ে যে গল্পটা মনের মধ্যে মোটামুটি গড়ে উঠেছিল, ক্ষীণ হ'তে হ'তে সে গল্প অবশ্য প্রায় মিলিয়েই গেছে। মৃন্ময়ের সেই কাহিনীর সঙ্গে বীণার পরবর্তী জীবনেরও তেমন কোন আর যোগ নেই। লিখতে হ'লে ওকে নিয়ে নতুন গল্পই লিখতে হবে। সেই কমলার

গল্প। মানে কমলার সঙ্গে বীণার যেটুকু যোগাযোগ হয়েছে সেই গল্প! এর মধ্যে মৃন্ময় নেই। আশ্চর্য, মৃন্ময় তবু যেন থাকতে চায়, যেন জড়িয়ে যেতে চায় পরের গল্পের সঙ্গে, কেন? মৃন্ময় আমার সহকর্মী বলে? তার সঙ্গে রোজ দেখা হয় বলে? কিন্তু মৃন্ময়ের গল্প সম্পূর্ণ আলাদা। দুঃস্থা বান্ধবীর চিকিৎসার জন্য বীণার প্রাণপণ প্রয়াসের মধ্যে মৃন্ময়ের কোন ভূমিকা নেই। এমন কি এক টাকা দামের একখানা টিকেট পর্যন্ত মৃন্ময় সেদিন কেনেনি। কিন্তু শুধু ভাব নিয়েই তো নয় অভাব নিয়েও গল্প হ'তে পারে। মৃন্ময় যে নেই, মৃন্ময় যে রইল না তাই নিয়ে সুরু হ'তে পারে বীণার দ্বিতীয় গল্প। ব্যর্থ প্রেমে বীণা হা হুতাশ করে বেড়াল না। কারণ সময় কই। হা হুতাশের জন্য প্রেম ছাড়া আরো অনেক বস্তু আছে। আছে দারিদ্র্য, টাকা পয়সা নিয়ে কথায় কথায় বাপের সঙ্গে ঝগড়া, যাতে হাত দেয়, তাতেই ব্যর্থ হওয়ার ক্ষোভ! বীণার চিন্তা আর চেষ্টা এসব নিয়েই আচ্ছন্ন থাকতে পারে। শুধু প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখতে হয় মৃন্ময়কে। তার অনুপস্থিতির মধ্যেই সে আছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে এ গল্পও নিজের কাছে মনঃপূত হোল না। বড় পুরোন পুরোন লাগল। বীণার সমাজ-চেতনা প্রেমের ব্যর্থতার জন্য অপেক্ষা করবে কেন? রূপের অভাবে, বাপের অর্থ সামর্থ্যের অভাবে যাকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থাকতে হয়, বাপ মা ভাই

বোনের ভরণ-পোষণের জন্য জীবিকার দায়ে যখন তখন ছুটে বেরুতে হয়, ছুটির পরে যার দু'পয়সার চীনা বাদাম ছাড়া আহার্য জোটে না, চোখের সামনে যে সহকর্মী কমলাকে বিনা ওষুধে, বিনা পথ্যে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখে, তার জীবনে মৃন্ময় আকস্মিক, মৃন্ময়কে বাদ দিয়েই তার জীবন-আখ্যান লেখা ভালো। খানিকটা লিখে ফের গল্পটা ছিঁড়ে ফেললাম। উঁহু, মৃন্ময়কে কিছুতে রাখা চলবে না।

অফিসে এসে কাজে ভালো করে মন দিতে পারলাম না। গল্পটা অনেকখানি এগিয়েছিল। ফের নতুন করে লিখতে হ'লে বহু শ্রম আর সময় দরকার। একজন সম্পাদক বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম। এ মাসে গল্পটা তাকে নিশ্চয়ই দেব। এবার না দিতে পারলে তিনি ভয়ঙ্কর চটে যাবেন। মৃন্ময়কে নিয়ে কি বিপদে পড়েছি তাতো আর তাঁকে বুঝানো যাবে না, গল্প না দিতে পারার কারণ হিসাবে একটা বাস্তব বিপদ আপদের গল্পই তাঁকে বানিয়ে বলতে হবে।

শক্ত মত একটা কৈফিয়তের কথা ভাবছি মৃন্ময় সামনে এসে দাঁড়াল। আজ আর বেশটা সাহেবী নয়। সাধারণ ধুতী পাঞ্জাবী। কিন্তু হাতের সিগারেটটি ঠিক আছে। ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মৃন্ময় মৃদু হেসে বলল, 'এই যে লিখছেন না কি ?' কি খবর আজকের ?'

ওর মরুব্বিয়ানায় বিরক্ত হয়ে মাথা তুলে বললাম, 'তেমন কিছু নেই।'

মৃন্ময়ের মুখে তবু হাসিটুকু লেগেই রইল, 'কিছু নেই তো অত কি লিখছেন।'

বললাম, 'কি লিখছি দেখতেই তো পাচ্ছেন।'

মৃন্ময় বলল, 'রাগ করছেন কেন, আজ আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতে দেখছি, কাল তো আর দেখব না। কাল থেকে আপনার মত আমাকেও ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে এমনি ক'রে কলম পিষতে হবে। হয়তো চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে তদারক করবেন সুপিরিয়ার অফিসার। অমন মুখ ভার করে থাকবেন না দাদা, হাসি মুখে বিদায় দিন।'

বললাম, 'তার মানে?'

মৃন্ময় মুখ মুচকে হাসতে লাগল।

আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি, কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

সহকর্মী পরেশবাবু বললেন, 'আপনি কিছুই জানেন না নাকি। মৃন্ময়বাবু সিভিল সাপ্লাইতে চাকরি পেয়েছেন। কাল জয়েন করবেন।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কি? আমি তো কিছুই জানতাম না।'

'জানবেন কি ক'রে? মৃন্ময়বাবু কি আর খবরটা ফাঁস ক'রেছেন কাউকে? আমিই প্রথমে স্কুপ করেছিলাম। এ্যালাউন্স ট্যালাউন্স নিয়ে বুঝি শ' আড়াই টাকা, না মৃন্ময়বাবু?'

মৃন্ময় একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'প্রায় ওই রকমই। দু'শো পঁয়ষট্টি।'

পরেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা করিৎকর্মা লোক যা হোক। আমাদের কথা একেবারে ভুলে যাবেন না। আপনাকে যা বলেছি মনে থাকবে তো?'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'থাকবে না কেন।'

পরেশবাবু বললেন, 'আর আমাদের চা'টা।'

মৃন্ময় বলল, 'প্রথম মাসের মাইনে পেলে ওসব হবে পরেশবাবু। আজ পকেট একবারে খালি। লনড্রী থেকে স্যুটটা খালাস ক'রে আনতে গিয়ে সব গেছে। কাল তো পরে বেরুতে হবে। সেই যে গল্পে আছে না মানি ব্যাগ কিনবার পর দেখা গেল ব্যাগে রাখবার মত মানি আর নেই, এও তেমনি। পকেটের সব পয়সা দিয়ে তো স্যুট ধুইয়ে আনলাম এখন যদি ট্রামের ভাড়াটা কাল না জোটাতে পারি তাহলেই গেছি। যা বৃষ্টিবাদল চলছে কদিন ধরে, হেঁটে যেতে হলে অফিসে একেবারে ভূত সেজে উপস্থিত হতে হবে।'

একটু অবাকই হলাম। এমন বিনয়, আর্থিক দীনতা নিয়ে এমন খোলাখুলি আলোচনা মৃন্ময়কে আর কোনদিন করতে দেখিনি। নিজের রোজগার দেড়গুণ বাড়তে চলেছে বলেই কি মৃন্ময় হঠাৎ এমন সরল আর বিনয়ী হয়ে উঠেছে?

আমার দিকে তাকিয়ে মৃন্ময় বলল, 'কি, আপনি আজ আর মুখ খুলবেন না ঠিক করেছেন নাকি? নিন, ধরান।'

মৃন্ময় একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, 'এইটাই অবশিষ্ট ছিল।'

বললাম, দরকার নেই, আপনিই ওটা রাখুন, পরে খাবেন।'

মৃন্ময় বলল, 'কি মুশকিল, আপনার রাগ কি কিছুতেই ভাঙবে না ?'

হেসে বললাম, 'রাগ কেন করব। বরং আপনিই হয়ত রাগ করে এতবড় খবরটা আমাকে জানাননি।'

মৃন্ময় কৈফিয়তের সুরে বলল, 'এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা সবে কাল পেয়েছি। জানেন তো চাকরি বাকরির ব্যাপার। না আঁচান পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস ছিলনা। তাছাড়া খবরটা সত্যিই কি খুব বড় ? আড়াইশ টাকায় কি হয় আজকাল ?'

হেসে বললাম, 'তবু তো কথাটা চেপে যাচ্ছিলেন।'

মৃন্ময় আমার দিকে তাকাল, 'শেষ পর্যন্ত চাপতাম না। আপনার কাছে কি কোনদিন কিছু চেয়েছি ?'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মৃন্ময় আর দাঁড়াল না। 'আচ্ছা, চলি এবার।'

মনটা একটু যেন কেমন লাগতে লাগল। গল্প থেকেই মৃন্ময়কে ছেটে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অফিস থেকেও যে ও সরে যাবে তা ভাবিনি। অবশ্য মৃন্ময় এই চাকুরিগত সৌভাগ্যের অযোগ্য নয়। চালাক চতুর, দেখতে শুনতেও ভালো। এম, এ,তে ইংরেজী ভাষায় হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল।

যেমন খাটতে পারে, তেমনি জানে বলতে কইতে। অফিসে এসে কাগজ খুলে wanted column টার উপর মৃন্ময় সবচেয়ে আগে চোখ বুলাত। সেক্রেটারিয়েটে ওর কি রকম যেন একটু জানাশোনা আছে তাও শুনেছিলাম। আজকালকার দিনে একটু ভালো চাকরি সংগ্রহ করতে পেরেছে ভালোইতো। পোষ্যের সংখ্যা ওরও তো নেহাৎ কম নয়। বীণা আর তাদের পরিবারের সঙ্গে মৃন্ময় যেমন ব্যবহারই করে থাক, অফিসের সহ-কর্মীদের সঙ্গে ওর মোটামুটি সদ্ভাবই ছিল। দোষের মধ্যে চা-টা নিজের পয়সায় খেত না। কিন্তু তা যেমন খেত না, তেমনি এক কাপ চায়ের বদলে ওকে দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে দেড় কলম নিউজ লিখিয়ে নেওয়া যেত। আমিই তো কতদিন লিখিয়েছি।

মৃন্ময় চলে যাওয়ার পর, সারাটা দিন কেবল ওর আলোচনাই চলতে লাগল! দোষের চাইতে ওর গুণগুলিরই উল্লেখ হোল বেশী।

মৃন্ময়কে ছেটে দিয়েও অবশ্য গল্পটাকে এগিয়ে নিতে পারলাম না। দু'দিন সময় নিলাম। তবু নয়। সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে সৌহার্দ্য যায় যায় হবার জো হল। তারপর মাস কয়েকের মধ্যে বীণা আর মৃন্ময় আমার মন থেকে একেবারে হারিয়ে গেল।

বছর খানেক বাদে সন্ধ্যার পর সেদিন ট্রামে করে শ্যামবাজার থেকে ফিরছি। গাড়িতে খুব ভিড়। তবু কৌশলে

আর একজন দণ্ডায়মান সহযাত্রীর অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁর সামনের বেঞ্চের সন্ত খালি হওয়া একটি সীট দখল করে কেবল বসেছি, সামনে ঝনঝন করে চাঁদার কৌটা নড়ে উঠল। শব্দটা খুব শ্রুতিমধুর নয়। বিরক্ত হয়ে মুখ তুলতেই দেখি বীণা। লাল পেড়ে শাড়ি পরণে, সেফটি পিন দিয়ে আঁটা কাঁধে লাল রঙের একটি ব্যাজ, কৌটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা 'যক্ষ্মা নিবারণী সাহায্য সপ্তাহ।'

বললাম, 'আপনি!'

বীণা মৃদু হেসে চাঁদার কৌটা ধরে রইল সামনে।

পকেটে খুচরো বিশেষ কিছু ছিল না। একখানা সিকি তুলে অলক্ষিত ভাবে কৌটার ভিতরে গলিয়ে দিলাম।

বীণা বলল, 'কোথায় চলছেন।'

বললাম, 'গণেশ এভিনিয়ু্য।'

বীণা বলল, 'তাই নাকি। আমিও তো ওর কাছাকাছি নামব। কমলাকে দেখে যেতে হবে একটু।'

বললাম, 'তিনি কেমন আছেন।'

বীণা ঘাড় নাড়ল, 'ভালো না। যাবেন একবার দেখতে। আপনার গল্প ওকে মাঝে মাঝে বলেছি। আলাপ করতে চেয়েছিল আপনার সঙ্গে।'

ইতস্তত করে বললাম, 'কাজ ছিল একটু। আচ্ছা চলুন।'

বীণা কৌটা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আরো

একটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলছিল। ট্রামটা বউবাজারের মোড় পেরুতেই বীণা তার কাছে কৌটোটা দিয়ে বলল, 'লতা, আমি এবার নামব ভাই, আমার একজন অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাব।'

লতা বোধ হয় আমার সঙ্গে বীণাকে কথা বলতে দেখেছিল। আমার দিকে একটু তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে বীণার হাত থেকে কৌটোটা নিতে নিতে মৃদু হেসে বলল, 'আচ্ছা এস। বন্ধুর কথা বুঝি হঠাৎ মনে পড়ল।'

ষ্টপেজে একসঙ্গে নামলাম। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বীণা বলল, 'তারপর কেমন আছেন। অনেক দিন দেখা সাক্ষাত নেই।'

বললাম, 'আপনিও তো আর খোঁজ নিতে চেষ্টা করেন নি।'

'অনেকদিন ভেবেছি নেব। কিন্তু নানা ঝামেলায়—'

আমি ভাবলাম বীণা হয়ত মৃন্ময়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে, কিংবা শো'তে না যাওয়ার অনুযোগ দেবে। কিন্তু কোন প্রসঙ্গ না তুলে বীণা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

বললাম, 'আপনার বন্ধুকে কি বাসাতেই রেখেছেন? কোন হাসপাতালে দেন নি কেন।'

বীণা একটু হাসল, 'সীট পেলে তো দেব। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া কোথাও সীট খালি নেই। দু' যায়গাতেই ওয়েটিং লিষ্টে নাম আছে। কিন্তু কমলা ততদিন ওয়েট করতে পারবে কিনা জানিনে।'

দুজনে ফের একটু কাল নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলাম।

বললাম, 'চাকরি করছেন তো? না ছেড়ে দিয়েছেন?

বীণা আমার দিকে তাকাল, 'বাঃ ছেড়ে দিলে চলবে কেন? আজকেও তো দুটো পর্যন্ত ডিউটি দিলাম।' তারপর বীণা একটু হাসল, 'আপনি বুঝি চাঁদা তুলতে দেখে ভেবেছেন সব ছেড়ে ছুড়ে সেবাকার্যে নেমে পড়েছি। তা কেন। একটা কিছু করতে হলেই যে আর একটা ছাড়তে হবে তার কি মানে আছে। আমরা সবদিক চাই, চাকরিও করব, ঘর সংসারও দেখব, আবার সাধ্যমত অন্য কাজ কর্মও করব। আমার তো মনে হয় কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। একটির সঙ্গে আর একটি জড়ানো অবশ্য শক্ত, ভারি শক্ত। বাদ দিতে না চাইলেও বাদ পড়ে যায়। এই তো দেখুন এ তিনদিন ধরে কমলার আর খবর নিতে পারিনি। ভারি অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। ও নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে।'

বললাম, 'চাঁদা তুলছিলেন তো হাসপাতালের জন্য—'

বীণা একটু হাসল, 'অথচ কোন হাসপাতালেই তো কমলাকে এখনো ভর্তি করতে পারিনি। তবু কেন খেটে মরছি তাই বলছেন তো।'

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'না না আমি তা বলিনি।'

বীণা আমার দিকে তাকাল, 'আপনি বলেন নি কিন্তু কমলা তাই বলে। শুধু কমলা কেন, মাসীমা মেসোমশাই পর্যন্ত এর জন্য বিরক্ত হয়েছেন। কি আশ্চর্য দেখুন।

কমলার না হয় অসুখ। ভুগে ভুগে ওর মন ঠিক নেই, নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা ও ভাবতে পারে না। কিন্তু আর সবাই যখন—'

বীণা হঠাৎ থেমে গেল। আমার মনে পড়ল নিজের বাপ মার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধেও বীণা আরো তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেছিল। এখানে ভাষাটা তত তীব্র নয়, কিন্তু ভঙ্গিটা প্রায় সেই রকমই। ধরণটা আমার ভালো লাগলনা। চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম।

একটু বাদে বীণা বলল, 'প্রথম প্রথম আমিও শুধু কমলাকে নিয়েই ছিলাম। আর কারো কথা মনে হোতনা। কিন্তু কয়েকটা হাসপাতালে দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করে আমার ভুল ভাঙ্গল। দেখলাম হল-ভরা কমলার দল। আরো শত শত হাজার হাজার কমলা কত জায়গায় রয়েছে। তারা কোন হাসপাতালের হলে স্থান পায়নি আমার মত অনেকেই দেখলাম মুখ কালো করে ফিরে যাচ্ছে।'

বললাম, 'আপনি বুঝি ওসব জায়গায় অনেক বার গেছেন?'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ' প্রথম প্রথম ভাবলাম হাসপাতালের অথরিটির দোষ। তারা চক্রান্ত করে আমার বন্ধুকে নিচ্ছে না। কিন্তু দেখে শুনে বুঝতে পারলাম তা নয়। এক আধটু দোষ থাকলেও সব দোষ ওদের ঘাড়ে চাপান যায় না।'

বললাম, 'দোষ কার ?'

বীণা হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দোষ নয় কার ? আপনি জানেন না কার দোষ ? যক্ষ্মার বীজ কি কেবল কমলার মধ্যেই ঢুকেছে ? আমিতো দেখছি, সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে সেই সর্বনাশা ক্ষয় রোগের জার্ম।'

বীণা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে শান্ত মানুষ পেয়ে একটু বক্তৃতা দিয়ে নিলাম। শহরে ১৪৪ ধারা রয়েছে। সভা সমিতি তো আর করবার যো নেই।' এবার আর বক্তৃতার ঢংগে নয় শান্ত করুণ স্বরে বীণা বলতে লাগল, 'দেখলাম কমলারা একা নয়, আমিও একা একা কিছু করতে পারব না। আরো আরো অনেককে সঙ্গে নিতে হবে। কেবল চাঁদার কৌটাটাই নয়, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আরো দু' চার জায়গায় ঘোরাঘুরি করলাম। অনেক মত আর পথের অলিগলি। একেবারে গোলক ধাঁধা।'

হেসে বললাম, 'গোলোক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে শেষে বুঝি এবার ঘরে ফিরবার মতলব করছেন ?'

বীণা মাথা নাড়ল, 'জানেনই তো বার টান একবার ধরলে আর ঘরে ফেরা যায় না। বার বার ঘর-বার করতে হয়। তাই করছি। এই যে এসে পড়েছি। এই বাড়িই কমলাদের।'

পুরোন একতলা একটা বাড়ি। কাছেই মোষের বাথান। মোষগুলির লেজ নাড়ার শব্দ শোনা গেল। কেবল শব্দ নয়, বিশ্রী একটা গন্ধও ভেসে এল সঙ্গে সঙ্গে। নোংরা গলি।

ছোট একটু রোয়াক আছে সামনে। বীণা তার উপর উঠে কড়া নাড়তে লাগল।

একটু বাদে ভিতর থেকে একটি মেয়ের ক্ষীণ গলা শুনতে পেলাম, 'ও মেজদা, দেখনা কে ডাকছে বাইরে। যাও, দরজাটা খুলে দিয়ে এসো।'

পাশের ঘর থেকে একজন পুরুষের অসহিষ্ণু বিরক্তি-ভরা গলা শুনতে পেলাম, 'আঃ, যখন তখন বড় বিরক্ত করিস কমল, কে এল আবার।'

বাইরে থেকে বীণা বলল, 'আমি। দোরটা খুলে দিন।'

অপ্রসন্ন ভাবে জবাব এল, 'ও বীণা! যাচ্ছি দাঁড়াও।'

একটু বাদেই স্যাণ্ডালের শব্দ শোনা গেল, তার পরই দরজার হুড়কে খুলে পড়ার আওয়াজ এল কানে। লম্বা ছিপছিপে চেহারার শ্যামবর্ণ বছর তিরিশের এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। উসকো খুসকো চুল। মুখে অপ্রসন্নতার ছাপ তখনো লেগে রয়েছে। বসন্তের দাগ না থাকলে মুখখানাকে সুন্দরই বলা চলত। নাক চোখ টানা

টানা। কিন্তু তা সত্বেও দেখে চোখ প্রীত হয় না। বসন্তের দাগের জন্যই হোক বা ওঁর অপ্রসন্ন মেজাজের জন্যই হোক একটা নীরস রূপ যেন সমস্ত চেহারার মধ্যে মিশে রয়েছে।

'এসো।'

বলেই ভদ্রলোক চলে যেতে উদ্যত হলেন। অপরিচিত আর একজন লোক যে পাশেই দাঁড়িয়ে তা যেন তাঁর খেয়ালই নেই। এই তাচ্ছিল্যে আমি একটু ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারলাম না। কিন্তু ভদ্রলোককে বীণা বাধা দিয়ে বলল, 'কমলা কেমন আছে ?

'একই রকম। ভিতরে এলেই তো দেখতে পারবে।'

বীণা বলল, 'পরশু দিন তো ভালোই দেখে গেছি। তার পর তো আর জ্বর হয়নি ?'

'কি জানি, ভিতরে এসো।'

দরজার ওপরে সরু এক ফালি প্যাসেজ। সেখান থেকে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে বীণা বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। কমলার মেজদা, বিমল মুখোপাধ্যায়। আর্টিষ্ট।'

নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'ও।'

বিমল বাবু বললেন, 'ও মানে, আপনি কি আমার ছবি কোথাও দেখেছেন ?'

বললাম, 'না।'

বিমল বাবু একটু হাসলেন, 'না দেখাই স্বাভাবিক। ভদ্র নাগরিকদের কাছে চিত্র মানে আজকাল শুধু চলচ্চিত্র।'

আমি বললাম, 'বই মানেও তাই।'

বিমল বাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনি গল্প করুন, আমি ততক্ষণ হাতের কাজটুকু শেষ করি গিয়ে।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমি একটু অবাক হয়ে রইলাম।

বীণা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। কমলা এঁর কথাই তোকে বলেছিলাম। আহা, শুয়ে থাক না তুই, উঠছিস কেন আবার।'

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম। ঘরের দক্ষিণ দিকে একখানা তক্তপোষে একটি মেয়ে শুয়ে আছে। গলা পর্যন্ত একটা হলদে চাদরে ঢাকা। রঙ ফর্সাই ছিল, এখন ফ্যাকাসে। ভারি শীর্ণ চেহারা। লম্বাটে মুখের গড়ন মোটামুটি সুন্দর। রোগ আর রোগশয্যা যেন ওর দেহের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে। বয়স বছর বাইশ তেইশের বেশী হবে না। রোগা বিশীর্ণ মুখে দেখে আরো কম মনে হয়।

দেয়ালের তাকে কয়েকটা ওষুধের শিশি, আধখানা বেদানা, আর একটা কাগজের ঠোঙা। হয়তো আঙুর টাঙুর কিছু হবে।

কমলা উঠে বসতে বসতে বলল, 'সারা দিনরাত কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে।' তারপর আমার দিকে তাকাল কমলা 'আপনার কথা বীণার কাছে অনেক শুনেছি।'

বললাম, 'আপনার কথাও বীণা দেবী বলেছেন। কেমন আছেন আজকাল?'

কমলা একটু হাসল, 'ভলোই আছি।'

বীণা বলল, 'ভালো তো আছিস। কিন্তু চোখ মুখ অত ছল ছল করছে কেন, দেখি।'

ঝুঁকে পড়ে বীণা ওর কপালে হাত দিল, মুখটা একটু যেন গম্ভীর দেখাল বীণার।

কমলা বলল, 'জ্বর হয়েছে, না?'

বীণা বলল, 'এই সামান্য একটু। ওষুধ টষুধ পড়ে রয়েছে যে।'

কমলা একটু হাসল, 'কই পড়ে রয়েছে। একসঙ্গে সব ওষুধ ঢক ঢক করে গিলে খেলে তোরা বুঝি খুসি হস? যাকগে, তোকে আর ডাক্তারী করতে হবে না। তোর সভা সমিতির খবর কি তাই শুনি। প্রায় একটা লিডার টিডার হয়ে গেছিস, না? সেই জন্যই দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

বীণা একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'মাসীমা কোথায়?'

'এতক্ষণ তো এখানেই ছিলেন, উঠে বুঝি রান্নাঘরে গেছেন।'

'মেসোমশায় এখনো বুঝি ফেরেন নি?'

কমলা বলল, 'তুই কি নতুন এলি নাকি? এত সকালে কবে তিনি ফেরেন। আবার বুঝি নতুন একটা পার্ট টাইম জুটিয়েছেন, কি একটা হোসিয়ারীতে। ওঁরও আমার দশা হবে।'

বললাম, 'সেখানে কি করেন তিনি ?'

কমলা হাসল, 'এ্যাকাউণ্টের কাজই দেখেন, বুড়ো মানুষ, খুব খাটনি পড়ে।'

বীণা বলল, 'বিমলদার এ সময় যদি কিছু একটা জুটত, সুবিধা হোত।'

কমলা বলল, জুটল তো কবারই, কিন্তু টি'কল কই। ওঁর ত চাকুরী পোষাবে না। সেই সেবার ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ করে তুই যখন আমাদের বড় বাজার এক্সচেঞ্জে এসে ঢুকলি তার দিন কয়েক পরেই তো মেজদা ডি, জে কেমারে ভালো একটা চান্স পেয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারল কই।'

কমলার মেজদার অযোগ্যতা সম্বন্ধে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের প্রথম আলাপ বুঝি বড়বাজার এক্সচেঞ্জেই ?'

কমলা খুসী হয়ে অফিসের গল্প আরম্ভ করল। অসুস্থতার জন্য অফিসে সে আর যেতে পারে না। সেই জন্যই রোগশয্যায় অফিসের স্মৃতি যেন তার কাছে এক মধুর, রোমাণ্টিক স্বপ্নের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। যখন অফিসে যেত, কমলা তখন সুস্থ, সবল, সক্রিয় ছিল। অফিস তার জীবনের যেন এক গৌরবময় অধ্যায়।

আই, এ, পাশ করে বি, এ, তে কি কি বিষয় নেবে জল্পনা কল্পনা করছে, কমলার বড় দাদা অমল মুখার্জী ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন। তাঁর চাকরিই ছিল সংসারের বড়

সম্বল। বাবা মুষড়ে পড়লেন। বিমলের তো কোন চালচুলো নেই, মতেরও কিছু স্থিরতা নেই, সংসারের উপায় কি হবে।

কমলা বলল, 'ভেবনা বাবা আমিও তো আছি।"

কিন্তু টেলিফোন অফিসে কাজ করতে দিতে কমলার বাবা মোটেই রাজী নন। কয়েক বছর আগেও দলে দলে এত বাঙ্গালী মেয়ে ওখানে কাজ করত না। বাবা আর মা তুজনেই ওজর আপত্তি করলেন। কিন্তু কমলা প্রায় জোর করেই চাকরি নিয়ে বসল। আত্মীয় স্বজন মহলে একটু নিন্দা মন্দ হোল। ভালো একটা বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল সেটা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু কমলার তা বলে ক্ষোভ নেই, ও গোপনে গোপনে সকাল বেলায় বি, এ, ক্লাসে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। নিতে পেরেছে নিজের পছন্দমত বিষয়। ওর এই বিদ্যানুরাগ দেখে মেজদা খুব খুসী। কিন্তু মা প্রায় রোজই বকতেন, 'অফিস থেকে এসেই বই নিয়ে উপুড় হয়ে পড়িস, এত খাটনি কি শরীরে সইবে।'

তখন কিন্তু সয়েছিল। তখন শরীর বলে যে কিছু আছে তা মনেই হয়নি কমলার। নিরবয়ব মন যেন সর্বত্র চলা ফেরা করছে। দেহের ভার, দেহের ক্লান্তি সে গ্রাহ্য করে না।

মাস কয়েকের মধ্যেই অফিসে খুব নাম হয়ে গেল কমলার। দক্ষতার প্রশংসা জুটল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে। প্রমোশন প্রায় হয় হয়। কিন্তু হঠাৎ একটি ব্যাপারে প্রমোশনটা আটকে গেল।

এইটুকু বলে বীণার দিকে তাকিয়ে কমলা একটু হাসল, 'থাকগে।'

বীণা বলল, 'থাকবে কেন, বলনা।'

'নাঃ, ভারি ক্লান্তি লাগছে।'

বলে মাথাটা দেয়ালে একটু ঠেস দিয়ে রাখল কমলা। বীণা উঠে গিয়ে নিঃশব্দে বালিশটা তুলে ওর মাথার পিছনে বসিয়ে দিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলবে কি, ওর প্রমোশন না পাওয়ার জন্য দায়ী ছিলাম আমি!'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আপনি?'

হ্যাঁ, বীণাই পরিপন্থী হোল কমলার উন্নতির। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ করে বড়বাজার এক্সচেঞ্জ অফিসে সবে নতুন গিয়েছে বীণা, কারো সঙ্গেই তেমন করে আলাপ জমেনি। সব নতুন মুখ। যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ফাঁকে ফাঁকে এক আধটু গল্প গুজব হাসি ঠাট্টা অবশ্য চলেছে, কিন্তু সে কেবল ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের সঙ্গে। নিঃসঙ্গ বীণা কাজ করতে করতে ঘেমে উঠল। আর একজন অপারেটর বিয়ে হবে বলে ছুটি নিয়েছে তার জায়গায় আর কোন মেয়েকে দেওয়া হয়নি। দুজনের কাজ একা বীণাকেই সামলাতে হচ্ছে। অফিস টাইম, কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। কলের পর কল আসছে। হঠাৎ কি হল, উঁচু বোর্ডে হাত বাড়িয়ে একটা কানেকসন দিতে গিয়ে হাতটাই কাঁপল না মাথার ভিতরটাই একটু কেমন করে উঠল, ঠিক যেন বুঝতে পারল না বীণা।

জ্ঞান ফিরে আসবার পর বড় হল ঘরের মধ্যে আশে পাশে ভীড় দেখে বীণা প্রথম টের পেল সে. অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। চোখ তুলে দেখল একটি মেয়ে আইস ব্যাগ চেপে ধরেছে তার মাথায়। মেয়েটিকে চিনতে দেরি হোল না। বীণার পাশের চেয়ারে বসেছিল সে খানিকক্ষণ আগে। কাজ সম্বন্ধে বীণা দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাওয়ায় ভারি বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। বীণা আর তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সেই কমলার কথাই বীণা প্রথম শুনল, 'এখন কেমন বোধ করছেন।'

কত মিষ্টি গলা, কত সুন্দর মুখ। মানুষের মুখের চেহারা কি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

কিন্তু ক্লার্ক ইনচার্জ কমলাকে ক্ষমা করেনি। সে বলেছিল, 'আপনি যান। ওকে নার্স করবার জন্যে অন্য লোক আছে। আপনি কেন কাজ ফেলে এলেন, বোর্ডে কাজ সাফার করছে আপনার।' কমলা বলেছিল, 'সে জন্য আপনি ভাববেন না। আমি ওখানে লোক দিয়ে এসেছি। কিন্তু আনকোরা নতুন একটি মেয়ের ঘাড়ে আপনি দু'জন অপারেটরের কাজ চাপাতে গেলেন কেন?'

ক্লার্ক ইনচার্জ চটে উঠল, 'সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে? তার আগে আপনি কেন ডিসিপ্লিন ব্রেক করলেন সেই এক্সপ্লানেশন সাবমিট করুন। না হলে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেটকে জানাতে বাধ্য হব।'

কমলাও ছেড়ে কথা বলল না। বেশ খানিকক্ষণ তর্কবিতর্ক চলল। প্রমোশন বন্ধ হল, কিন্তু তাই বলে দু'জনের মধ্যে আলাপ পরিচয়, অন্তরঙ্গতা বন্ধ হোল না। নাইট ডিউটি শেষ করে রাত দুটোর সময় পাশাপাশি বেডে শুয়ে দুজনের চোখে ঘুম আসত না, দুজনের মনে ক্লান্তি আসত না। যা আর কাউকে বলা যায় না, তেমন অনেক গোপন সুখের কথাই বীণা ওকে বলেছে, যে দুঃখ আর কাউকে জানিয়ে লাভ নেই, তাও জানিয়েছে ওই কমলাকেই।

বীণা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমলা আমার জন্য যা করেছে— ।'

কমলা মৃদু হাসল, 'কেবল বীণাই কারো জন্য কিছু করেনি।'

দোরের কাছে একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন। হাতে একটা বাটি। বোধ হয় মেয়ের পথ্য আছে ওতে। খাটো আঁচলের তলায় পুরু সিঁদূরের রেখা, কপালে সিঁদূরের ফোটা নেই তার বদলে গোটা দুই মোটা মোটা রগ ভেসে উঠেছে। হাতে দুগাছি শাঁখা ছাড়া আর কোথাও কোন আভরণ নেই।

আমাকে দেখে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'বীণা, এটা নাও তো।'

'ঘরে আসুন না মাসীমা। ইনি আমাদের একজন বন্ধু, কমলাকে দেখতে এসেছেন।'

তিনি ঘরে ঢুকে আমার দিকে নিঃশব্দে একটু তাকালেন। মুখে কথা না থাকলেও, দৃষ্টিতে শূন্যতা ছিল না। কোটরগত ক্লান্ত চোখ ছুটি মুহূর্তের জন্য যেন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল। বীণার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'একে তো এর আগে দেখিনি।'

'না, আজই প্রথম এলেন।'

পথ্যের বাটি নিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই কমলা অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, 'আবার কি নিয়ে এসেছ?'

ক্ষীণ শান্ত স্বরে যে মেয়েটি এতক্ষণ কথা বলছিল এ যেন সে নয়।

'কি আবার, একটু ছুধ।'

'না না, আমাকে আর জ্বালাতন করো না, মা। আমি কিছুই খাব না; ছুধ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল।'

বাটিটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে কমলার মা বীণার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কদিন ধরেই এমন করছে। পারো তো খাওয়াও।'

তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন।

বীণা বলল, 'কেন অমন করছিস বলতো, না খেলে শরীর ভালো হবে কি করে।'

'থাক থাক, শরীর আর ভালো হয়ে দরকার নেই আমার।'

বীণা এবার আমার দিকে তাকাল, 'জানেন, কমলা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতাও লেখে। তাই দেখাবার জন্যই আপনাকে ডেকে এনেছি।'

এবার কমলার মুখে একটা লজ্জার ছাপ পড়ল, 'না না, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না আপনি।'

বীণা বলল, 'আচ্ছা বিশ্বাস যাতে করতে পারেন, তার প্রমাণ দিচ্ছি আমি।'

পাশের বইয়ের র‍্যাক থেকে বোধ হয় ওর কবিতার খাতাই বের করবার জন্য বীণা উঠে দাঁড়াল।

কমলা ব্যস্ত হয়ে ওর হাত টেনে ধরল, 'এই।'

বীণা বলল, 'বেশ, তাহলে লক্ষ্মী মেয়ের মত এই দুধটুকু খেয়ে নাও।'

দুধের বাটি ওর মুখের সামনে তুলে ধরল বীণা। আমি হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবার আমাকে উঠতে হবে।'

কমলা আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত ভঙ্গীতে বলল, 'কয়েকটা কবিতা আপনাকে আমি দেখাব। কিন্তু আজ নয়। ভারি কাটা ছেড়া অবস্থায় আছে। ভালো ক'রে তুলে নিয়ে আর একদিন—। আর একদিন আপনি আসবেন তো?'

বললাম, 'আসব।'

'তাহলে সেই দিনই দেখাব। বীণার সামনে নয়। ওকে সেদিন ঘর থেকে বের করে দিতে হবে। ও কবিতার মহা শত্রু। আগে এমন ছিল না—।'

কমলা হঠাৎ থেমে গেল।

বীণা সদর পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এল। বলল, ‘আমি একটু পরে আসছি। দেখি জোর টোর করে আরো কিছু খাইয়ে আসতে পারি কিনা। আপনাকে তো চা টা কিছুই দিলাম না।’

বললাম, ‘না না, তাতে কি।’

তারপর বীণা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ‘ইয়ে, আপনার বন্ধুর খবর টবর কি ?’

বুঝতে বাকী রইল না আমার কোন বন্ধুর কথা বীণা জানতে চায়।

বললাম, ‘আমাদের অফিসে আর নেই। মৃন্ময়বাবু ভালো সরকারী চাকরী পেয়েছেন।’

বীণা একটু হাসল, ‘আপনি যথার্থ সাংবাদিক নন। ও তো অনেক দিনের পুরানো খবর।’

‘নতুন খবর তাহলে কি।’

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘নতুন খবর, তিনি সহরে সুন্দরী মেয়ে বেছে বেছে বেড়াচ্ছেন। শুনেছি একটি সম্বন্ধ নাকি প্রায় ঠিকও হয়ে গেছে। হয়তো শিগগিরই একখানা গোলাপী রঙের নিমন্ত্রণের চিঠি পাবেন।’

এ খবর বীণা কি করে পেল তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না। খবরটা এর আগে আমিও একটু একটু শুনেছিলাম।

বীণা গুহ ঠাকুরতাকে নিয়ে একটা ভিন্ন ধরণের থীম মাথায় আসি আসি করছিল। ব্যষ্টির সেবা বনাম সমষ্টির সেবা। এক বচন আর বহু বচন। বীণা যেভাবে তার বন্ধুকে সেবা করছে এখনকার দিনে ঠিক ব্যক্তিগতভাবে ওই ধরণের সেবা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিংবা ওরকম কোন উপলক্ষ ঘটলে আমরা বিব্রত বোধ করি। আমাদের আনাড়ি হাতের শুশ্রূষায় রোগীও যে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তা নয়। আজকাল সেবা ধর্মের ধরণ বদলে গেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল রয়েছে, সেবার জন্য বিশেষভাবে ট্রেনিং নেওয়া নার্সরা আছে। আমরা সাধারণ ভদ্র গৃহস্থেরা যদি সেবা করতে চাই তার জন্য হাসপাতালের তহবিলে টাকা ফেলে দিলেই যথেষ্ট। কিংবা সিনেমা, থিয়েটার, জলসার কোন সাহায্য রজনীতে দামী সীটে, ফ্যানের নিচে গিয়ে বসলাম। নাচ দেখলাম, গান শুনলাম, প্রণয় নিয়ে নরনারীর হৃদয়-দ্বন্দ্ব উপভোগ করলাম। কোন রোগীর যন্ত্রণা-কাতর মুখ চোখে পড়ল না, রোগশয্যার বিশ্রী কোন গন্ধ নাকে ঢুকল না, আমরা জানলাম না যে আমরা সেবা করলাম। আবার যারা হাসপাতালে পাইকারী ভাবে চিকিৎসা আর শুশ্রূষার কাজ নিল তারাই কি সেবার কথা তেমন করে টের পেল। তারা জানল তারা চাকরি করছে। এই চাকরির মূল উদ্দেশ্য জীবিকার

সংস্থান, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ। আমাদের মত দশটা পাঁচটার কেরাণীদের কাছে কাগজ আর কলম যেমন বস্তুবাচক চিকিৎসক আর সেবিকাদের কাছে রোগীরাও তাই। অথচ এছাড়া আর কিইবা হতে পারে। সমাজ যত জটিল হচ্চে, আমাদের হৃদয় তত যান্ত্রিক রূপ নিচ্ছে, কারণ হৃদয়ের চাইতে যন্ত্র বেশী নির্ভরযোগ্য।

তবু শুধু যন্ত্র নয়, বীণা-যন্ত্রের মত হৃদয়-যন্ত্রও বুঝি মাঝে মাঝে কাঁদে, বুঝি মাঝে মাঝে বেজে উঠতে চায়। বীণার কাছে হাজার হাজার কমলা নৈর্ব্যক্তিক ভাব মাত্র, বস্তুর সামিল, আর কমলা একমাত্র ব্যক্তি। এই একান্ত ঘনিষ্ঠ পরমোপকারী বন্ধুর মধ্যে নিজেকে সে বিশেষভাবে ব্যক্ত দেখতে পায়। অথচ নিজের হাতে রুগ্ন বন্ধুর মুখে পথ্যের বাটী তুলে ধরতে গেলে, চাঁদা তোলার কাজ পড়ে থাকে। তা ছাড়া শুধু চাঁদা তোলাই তো বীণার ব্রত নয়; কেবল সেবায় তো তার মন ভরে না, কেবল সেবায় তো সে সমাধান পায় না, অপরাধীর শাস্তির জন্যও যে তার মুষ্টি বার বার উদ্যত হয়ে উঠতে চায়, তখন অভিমানিনী কমলা একান্তে সরে পড়ে ক্ষয় রোগে ভোগে।

বীণার মনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা গল্প লেখা যায় কি না কদিন ধরে চেষ্টা করে দেখলাম। কিন্তু তত্ত্বটি যেভাবে এল, কাহিনী সেভাবে ধরা দিল না। অথচ গল্পের পক্ষে তত্ত্ব আমের আঁঠি মাত্র, আমসত্ব নয়। শাঁস রস হোল কাহিনী আর চরিত্র। কোন কোন সময় আঁঠি আর শাঁস রস শুদ্ধ

পরিপক্ক সিঁদুরে আমটি লেখকের হাতে টুপ ক'রে পড়ে, কলমের ডগায় বিঁধে পাঠকের সামনে তাকে এগিয়ে ধরলেই হোল। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তা হয় না। হয়ত শুধু বাদুড়ে চোষা ভিতরের আঁঠিটিই পাওয়া যায়, কখনো বা ওপরের খোসাটুকু ছাড়া কিছুই আর থাকে না।

কিছুদিন বাদে ভবানীপুর থেকে আমাদের গাঁয়ের প্রতিবেশী কীর্তিময় গুহের একখানা পোষ্টকার্ড পেলাম। তিনি স্মলকজ কোর্টে ওকালতী করেন। এ্যাডভোকেট-শিপ পাশ করে রেখেছেন। কেস পেলে হাইকোর্টেও বের হন। দেখে আশ্বস্ত হলাম তাঁর চিঠি উকিলের চিঠি নয়। অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের পত্রালাপ। তিনি লিখেছেন সেদিন আমাকে পদ্ম পুকুর রোড দিয়ে যেতে দেখলেন। তিনিও তো ওপাড়ায়ই থাকেন। অথচ আমি ভুলেও তার বাড়ীতে একদিন পা দিই না। সুস্মিতা নাকি প্রায়ই আমার কথা বলে। সাহিত্য টাহিত্য সেও খুব ভালবাসে কি না। এবার ডিষ্টিংশনে বি, এ, পাশ করেছে। রবিবার দুপুরে তাঁর ওখানে আমার নিমন্ত্রণ। নিশ্চয় যেন যাই। আমার সঙ্গে একটু কথা আছে তাঁর।

অনেকদিন পরে খোঁজ নিয়েছেন কীর্তি কাকা। প্রতিবেশী মানুষ। এক সময় বেশ যাতায়াত ঘনিষ্ঠতাই ছিল।

আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। অন্য কাজকর্ম একটু ছিল, সেগুলির কোন রকম একটা ব্যবস্থা করে কীর্তিকাকার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

নতুন দোতলা বাড়ী। গোটা দোতলাটাই তিনি ভাড়া নিয়েছেন। ছোট বড় চারখানা ঘর। ভাড়া দেড়'শ। কথায় কথায় তিনি বললেন, 'এত ভাড়া টেনে আর পারা যায় না।' বেহালায় একটু জায়গা কিনে রেখেছেন। ডেরা বাঁধবার চেষ্টায় আছেন সেখানে। বললাম, 'ভালোই তো। এ চেষ্টা তো আগেই করা উচিত ছিল আপনার।'

কাকীমা বাড়ীঘর জায়গাজমি আত্মীয় স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এক ফাঁকে সুস্মিতাও এসে দাঁড়াল। এই ক'বছরে বেশ বড় হয়েছে। কেবল বড় নয়, সুন্দরও। ও যে এত সুরূপা হবে, ছেলে বেলায় ওর রোগাটে চেহারা দেখলে বোঝা যেত না।

সুস্মিতা হেসে বলল, 'তারপর কি খবর আপনার। মোটে দেখা সাক্ষাৎই নেই, কি লিখছেন টিকছেন।'

যেন সমবয়সী বান্ধবীর মত আলাপ করতে চায় সুস্মিতা। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় ওর অটুট। অন্য কেউ হোলে হয়ত একটু ক্ষুণ্ণ হতাম। কিন্তু এই আত্মচেতনা আর অহংকারের আভাসটুকু ওকে বেশ মানিয়েছে।

চর্বচোষ্য মন্দ হলো না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার পর ওরা ছাড়তে চাইলেন না।

কীর্তিকাকা বললেন, 'আরে বোসো বোসো। এত ব্যস্ত কেন।'

সুস্মিতা বলল, 'জলে তো আর পড়েন নি, বরং বাইরে গেলেই পড়বেন।'

বিকালের দিকে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছিল। হেসে বললাম, 'একটা সর্তে থাকতে রাজী আছি। যদি গান শোনাও।'

সুস্মিতা বলল, 'সাহিত্যে বুঝি সুবিধা হোল না, এবার তাই সঙ্গীত।'

এতক্ষণ সুস্মিতা সাম্প্রতিক সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের প্রায় কচুকাটা করছিল। কিছু হচ্ছে না, কেউ কিছু করতে পারছে না। সুস্মিতা আর তার বন্ধুদের অসন্তুষ্টির সীমা নেই।

সুস্মিতার কথার জবাবে বললাম, 'অনেকটা তাই। তোমাদের গলায় ঝগড়ার চেয়ে গানই মানায় ভালো।'

সুস্মিতা কৃত্রিম ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'গান আমি জানি? কার কাছে শুনলেন। মা বলেছেন বুঝি। ওঁর পেটে যদি কোন কথা থাকে। কিন্তু গলাটা ভালো নেই। থাকলে গাইতাম।'

বললাম, 'তার মানে আরো কিছুক্ষণ সাধাসাধি করতে হবে। তাতে পিছু পা হব ভেব না। এই তো দস্তুর। গায়িকা গলা সাধেন, শ্রোতার গায়িকাকে সাধতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের খান দুই বর্ষা সঙ্গীত শোনাল সুস্মিতা। ভালোই গায়।

বৈকালিক চা পর্বের পর বিদায় নিচ্ছি, কীর্তিকাকা তাঁর বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আরে শোন কথাটা, কথাটা প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম। ইয়ে মানে—মৃন্ময় নন্দী বলে তুমি কাউকে চেন? সিভিল সাপ্লাইতে কাজ করে। আগে নাকি তোমাদের অফিসে ছিল।'

মৃন্ময়ের সঙ্গে পরিচয়ের কথা স্বীকার করায় কীর্তিকাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি কেমন?'

মনে পড়ল গিরীনবাবুও একদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন।

বললাম, 'ভালোই তো।'

কীর্তিকাকা বললেন, 'হ্যাঁ ভালো তা আমিও স্বীকার করি। তোমার কাকিমা অবশ্য একটু আপত্তি করেছিলেন। বাড়ীঘরের অবস্থা তেমন সুবিধা নয়। তা ছাড়া বংশটাও একটু—। আমি বলেছি দেখ, অত দেখতে গেলে হয় না। কথায় বলে ছেলে দেখে মেয়ে দেবে। তা ছেলেটির সঙ্গে আমি তো ক'দিন আলাপ টালাপ করে দেখলাম। বেশ তুখোর ছেলে। চাকুরীতে ঢুকতে না ঢুকতেই একটা লিফট পেয়েছে। ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।'

কীর্তিকাকার কথায় সায় দেওয়ার পর তিনি আসল কথাটা ভাঙলেন। সুস্মিতার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছে মৃন্ময়ের। দেখে শুনে তার খুব পছন্দও হয়েছে। মৃন্ময়ের বাবা মাও

এসে দেখে গেছেন মেয়ে। কীর্তিকাকা শুনেছিলেন মৃন্ময়ের বাবা মৃত্যুঞ্জয় নন্দী খুব ঝানু লোক, কিন্তু সুস্মিতাকে দেখে তিনি পর্যন্ত কথাটি বলতে পারেন নি। দেনা পাওনার ভার সব কীর্তিকাকার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এতদিনে দিন তারিখ হয়ে যেত। কিন্তু মৃন্ময়ের কাছ থেকে এখনও পাকা কথা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মৃন্ময়ের যে পছন্দ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুস্মিতাকে দেখতে এসে প্রায় আমার মতই মৃন্ময় নাকি দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা তার সঙ্গে সাহিত্য সমাজ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। কেবল মৃন্ময়ই নয়, বিয়ের নামে সুস্মিতা যতই ঘাড় নাড়ুক ওরও যে ছেলে খুব পছন্দ হয়েছে সুস্মিতার বন্ধুদের কাছ থেকে সে খবর কীর্তিকাকা সংগ্রহ করেছেন। এখন মৃন্ময়ের মনোভাবটা কি। সে এত দেরি করছে কেন। মেয়ে পছন্দ হ'লে আজকালকার ছেলেরা তো দেনা পাওনা সম্বন্ধে তেমন দর কষাকষি করে না, মৃন্ময়ের সেদিকে তেমন ঝোঁক আছে নাকি। অবশ্য কীর্তিকাকার আরো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের দিকেও তাকাতে হবে ; তা ছাড়া যা দিনকাল আজকাল। তবু কীর্তিকাকা সুস্মিতার বিয়েতে কার্পণ্য করবেন না, সম্ভবত মৃন্ময়ের সব দাবী মেটাবারই তিনি চেষ্টা করবেন।

কথা শেষ হতে না হতে কাকীমাও এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, ওদের মনের ইচ্ছাটা তুমি আমাকে

দু'তিন দিনের মধ্যে জেনে দাও, আমাদের আরো পাঁচটা সম্বন্ধ আছে। এ ভাবে ঝুলিয়ে রেখে লাভ কি। তুমি তাহলে সামনের রবিবার কষ্ট ক'রে আর একবার এস। দুপুরে—'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'দুপুরে তো আমার সময় হবেনা।'

'তা হ'লে রাত্রে। রাত্রে অবশ্যই এসে এখানে খাবে। অত সংকোচ কেন তোমার। আপনা আপনির মধ্যে এত সংকোচ কি ভালো। মৃন্ময় সম্বন্ধে কি মনে হয় তোমার।'

বললাম, 'সুস্মিতাকে যে দেখবে সেই অবশ্য পছন্দ করবে। বিশেষ করে মৃন্ময় সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহই নেই।'

'এ কথা কেন বলছ।'

বললাম, 'সুন্দরী মেয়ের ওপর ওর বিশেষ ঝোঁক আছে।'

কাকীমা একটু হাসলেন, 'সে ঝোঁক কারই বা নেই বাবা।'

মনে হোল দরজার কাছ থেকে কে যেন গেল। সিঁড়ির মুখে দেখা হোল সুস্মিতার সঙ্গে। মৃদু হেসে বলল, 'তাহ'লে রবিবার সন্ধ্যায় ফের আসছেন তো? নিজের আর নিজের বন্ধুদের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি সেদিন গুছিয়ে লিখে নিয়ে আসবেন বুঝেছেন? সেদিন কিন্তু শুধু গানের সুখ্যাতি ক'রে পার পাবেন না।'

হেসেই জবাব দিলাম, 'আচ্ছা।'

যাই যাই ক'রেও দু'তিন দিন দেরি হয়ে গেল। তারপর একদিন মৃন্ময়ের অফিসে গিয়ে দেখা করলাম।

বেয়ারা এসে এক টুকরো শ্লিপ ধরল সামনে। নাম আর সাক্ষাতের উদ্দেশ্য আগে লিখে জানাতে হবে। নাম লিখলাম। উদ্দেশ্যের ঘরে কি লিখি ভেবে পেলাম না। তাই সেটা খালিই রইল। কিন্তু বেয়ারা তাতে সন্তুষ্ট নয়। সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'কেন এসেছেন সে কথাও লিখে দিন। না হলে বাবু বড় রাগ করেন। বহু বাজে লোক এসে প্রায়ই বিরক্ত ক'রে যায়।'

অগত্যা চাকরির কথাই লিখলাম। বেয়ারা ইংরাজী জানে। সেটুকু পড়ে মুখ মুচকে হাসল, 'কোথাও কিছু খালি নেই বাবু। কোন সুবিধা হবে না। রোজ কতলোক ঘোরাঘুরি করছে, কারোরই কিছু হয় না।'

বললাম, 'আচ্ছা তুমি নিয়ে তো যাও।'

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করতে হোল বাইরে। তারপর মৃন্ময় ডেকে পাঠাল। ছোট্ট ঘরের মধ্যে কোণাকোণি ভাবে টেবিল পাতা। সামনে খান তিনেক গদী আঁটা চেয়ার। দুদিকের র‍্যাকে লাল ফিতা বাঁধা স্তূপীকৃত ফাইল। সত্ত চুনকাম করা শুভ্র দেয়াল। ফ্যানের হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। আমাকে দেখে মৃন্ময় একটু উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল, 'আরে, আপনি যে। কি ব্যাপার। আসুন আসুন।'

জন দুই নিম্নতন কর্মচারী কি সব নির্দেশ উপদেশ নিতে এসেছিল তারা চলে গেলে মৃন্ময় বলল, 'তারপর কি খবর বলুন।'

দেখলাম মৃন্ময়ের স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে। দুটি গাল বেশ নিটোল, পরিপুষ্ট, স্কাই ব্লু রঙের হাওয়াইন সার্ট মৃন্ময়ের ফর্সা রঙের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। দেহে মনে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে মৃন্ময়।

বললাম, 'আর খবর। আপনি তো কোন খোঁজই নিলেন না।'

মৃন্ময় বলল, 'বাঃ নিলাম না মানে। আমি দুদিন গিয়েছি। আপনার দেখা পাইনি। তারপর এখানে এসে আর নিঃশ্বাস ফেলবার জো নেই, এদিক থেকে কাগজের অফিস অনেক ভালো ছিল। প্রথমে এত টাইট ফীল করতাম। শ্লিপে আপনি চাকরির কথা লিখেছেন যে।'

মৃন্ময় মুখ টিপে হাসল।

বললাম, 'কেন চাকরি কি আমরা করতে পারিনে?' মৃন্ময় বলল, 'পারবেন না কেন। কিন্তু আসল কথাটা কি বলুন তো।' বললাম, 'আসল কথাটা তো আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। যাক কোন সুবিধা টুবিধা আপনারা ক'রে দেবেন না তা জানি। কিন্তু কিছু একটা করে খেতে হবে তো? সেই জন্যই ঘটকালির ব্যবসা নেব নেব করছি।'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'তাই না কি? ভালোইতো। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন এবার।'

ব্যাপারটা বললাম, 'কীর্তিকাকা আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না। মৃন্ময়ের সুস্পষ্ট সম্মতি নিয়ে তিনি এবার দিন

তারিখ ঠিক করে ফেলবার জন্য উদ্‌গ্রীব।' পণ-যৌতুক সম্বন্ধে তিনি সম্ভবত কোন কার্পণ্য করবেন না সে কথাও জানালাম।

মৃন্ময় একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে চা কেক আনাল। গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট খুলে ধরল সামনে, নিজে একটা ধরাল। তারপর সুন্দর রঙীন কাচের কাগজ চাপাটা টেবিলের ওপর একটু একটু ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ বলল, 'ফোন অপারেটরদের সম্বন্ধে বোধ হয় আপনার আর কোন কৌতুহল নেই।'

বললাম, 'থাকবে না কেন, আছে।'

মৃন্ময় বলল, 'দেখা সাক্ষাৎ হয়।'

নেতিবাচক ভাবে ঘাড় নাড়লাম। কারণ আমার দেখা সাক্ষাতের বিবরণ বলবার জন্য আমি মোটেই উদ্‌গ্রীব নই, মৃন্ময়ের কাছে থেকে কিছু শুনবার জন্যই আমি উৎসুক।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা টেখা হয়েছিল নাকি?'

মৃন্ময় একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল, 'না না, ও সব ব্যাপারের পর কোন ভদ্রলোক ফের ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে? আপনি ভাবেন কি আমাকে?'

ফাইল নিয়ে একজন নিম্নতন কর্মচারী কি কাজের জন্য ঘরে ঢুকল। মৃন্ময় ফাইলটা রেখে তাকে বিদায় দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আজ যান। সোমবার এ্যাকশন নিলেই হবে। আজ আমার অন্য কাজ আছে।'

শনিবারের অফিস। দেড়টার মধ্যেই সব ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু মৃন্ময় নিজে উঠল না, আমাকেও উঠতে দিল না। বুঝতে পারলাম এই কাজের মানুষটিরও আজ কথার দরকার হয়ে পড়েছে।

হ্যাঁ, মৃন্ময়কে আমরা যা ভাবি তা নয়। সেও ভদ্রলোক। তারও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। সেই ব্যাপারের পর গিরীন-বাবু কি বীণার সঙ্গে কেউ সম্পর্ক রাখতে পারে না। মৃন্ময়ও রাখেনি। দোষ তো আর মৃন্ময় করেনি, করেছেন গিরীনবাবু আর তাঁর মেয়ে বীণা। ওরা আগে মাফ চাইবেন, তারপর যায় যদি মৃন্ময় যাবে। কিন্তু ওপক্ষ থেকে কেউ এগিয়ে এলনা, মৃন্ময়ের অহংকারে অবশ্য ঘা লাগল। কিন্তু মনকে বোঝাল— যারা অকৃতজ্ঞ তারা এমনই হয়। সেই ষ্টীমারঘাট থেকে এ পর্যন্ত বীণাদের জন্য মৃন্ময় কি না করেছে। নিতান্ত মৃন্ময় বলেই অমন একটি আধা শিক্ষিত, রূপহীনা মেয়ের দিকে সে তাকিয়েছে, কাছে ডেকেছে, আদর করেছে। আর কেউ হলে বুকে টেনে নেওয়া তো ভালো, হাত দিয়ে ছুঁতোও না অমন মেয়েকে। অবশ্য মনের এই জ্বালা কিছুদিন যেতে না যেতেই মিলিয়ে গেল। না মিলিয়ে জো ছিল না। আজকালকার দিনে নতুন চাকরি জোগাড় করা, চাকরি রক্ষা করা, আর উন্নতি করা তিনটিই অত্যন্ত আয়াস সাধ্য। চাকরি হোল জেলাস্ মিসট্রেস। নিঃশেষে হৃদয় মন সঁপে দিতে না পারলে তাকে খুসি করা যায় না। তাছাড়া মৃন্ময়ের বয়স

হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে। একটি মেয়ের সঙ্গে কবে কতটুকু কি হয়েছিল না হয়েছিল তা কেউ মনে করে রাখে না, মনে ক'রে রাখবার মত বিড়ম্বনাও আর নেই। মৃন্ময়ও মনে রাখল না। একটু ইচ্ছা ক'রেই ভুলে যেতে চেষ্টা করল এবং ভুলে যেতে পারলও। লোকজন আর কাজকর্মের এত ভিড়ের মধ্যে চেষ্টা করলেই কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, আর চেষ্টা না করলে তো কথাই নেই।

তবু একবার তিন নম্বর বাসে গিরীনবাবুর সঙ্গে মৃন্ময়ের দেখা হয়ে গিয়েছিল। ময়লা একটা পাঞ্জাবী গায়ে, খেরো বাঁধা কতকগুলি খাতা বগলে। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃন্ময় অবশ্য চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। গিরীনবাবুও কোন কথা বলেন নি। বরং সামনের ষ্টপেজে বাস থামলে বেশ একটু তাড়াতাড়িই যেন নেমে গেলেন।

বীণার সঙ্গেও একদিন বাস থেকে দেখা হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়ে বাস যাচ্ছে দুপুরের সময়। বেশি ভিড় ছিল না। জানলা দিয়ে মৃন্ময় বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল বীণাকে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অফিসেই চলেছে বোধ হয়। দুটোর সিফট। কিন্তু এই রোদের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে কেন। মাসের শেষ বলে বাসের পয়সাটাও কি নেই। তাছাড়া মৃন্ময় যে ওকে একটা সুন্দর ছাতা কিনে দিয়েছিল সেটাই বা কী হোল। সেটা কি ভুলে ফেলে এসেছে, হারিয়েছে, না মৃন্ময়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

হয়েছে বলে ইচ্ছা ক'রেই আনেনি। বাস থেকে নেমে গিয়ে বীণাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্য মৃন্ময় ভারি ঔৎসুক্য বোধ করল। মাঝে মাঝে মন এমন ছেলেমানুষি করতে চায়। কিন্তু পুরুষ মানুষ ধমক দিয়ে ছেলে মানুষকে সোজা রাখে। মৃন্ময়ও তাই করল। একটু বাদে আর একদল মেয়ের সঙ্গে মিশে বীণা গিয়ে ঢুকল অফিসে। মৃন্ময়ের বাস অবশ্য ততক্ষণ ফোন অফিসের দরজা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

তারপর খুব কাছাকাছির ঘটনা। সপ্তাহ দুই আগে জরুরী কাজের জন্য রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশনকে মৃন্ময় ফোনে ধরবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যতবার নম্বরটা চায়, শোনে লাইন এনগেজড, না হয় জংশন এনগেজড। এদিকে ফাঁকে ফাঁকে অপারেটরদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তা, একটু বা চটুল হাসি মৃন্ময়ের কানে আসছে। ভারি রাগ হয়ে গেল। মিনিট খানেক বাদে ফোন ধরে ফের যখন শুনল 'এনগেজড', মৃন্ময় ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'এখনও এনগেজড ?'

'হ্যাঁ।'

'হ'তেই পারে না। ভালো করে দেখুন।'

'দেখেই বলছি। লাইন ক্লিয়ার না পেলে কি ক'রে দেব ?'

'নিজেরা গাল গল্প নিয়ে মেতে থাকলে লাইন ক্লিয়ার কোন দিনই হবে না।'

'এসব আপনার বলবার কথা নয়।'

'বেশ তো যাঁর বলবার, তিনিই বলবেন। আমি ক্লার্ক ইন্‌চার্জকে চাইছি।'

'বেশ।'

খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ক্লার্ক ইনচার্জকে পেল মৃন্ময়। অপারেটরের অসদ ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল।

ক্লার্ক ইনচার্জ বলল, 'আচ্ছা আমি দেখছি। আপনি এবার ফোন করুন। নিশ্চয়ই পাবেন!'

আরও একবার রিসিভার তুলল মৃন্ময়।

শুনতে পেল, 'কি ব্যাপার বীণাদি, আপনার নামেও কমপ্লেন।'

আর একটি মেয়ের চটুল গলা শোনা গেল, 'সত্যি বড় তাজ্জব ব্যাপার। বীণা গুহঠাকুরতার নামেও কমপ্লেন। হবে না কেন। বীণা যা ঝগড়া করছিল। প্রায় দাম্পত্য কলহের মত।'

ফোন ধ'রে বিস্মিত অস্ফুট কণ্ঠে মৃন্ময় বলল, 'বীণা!' কিন্তু জবাব এল, 'রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশন স্পিকিং।'

দরকারী কথা শেষ করল মৃন্ময়, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য শেষ হ'তে চায় না। বীণা গুহঠাকুরতা! গলাটা প্রথম থেকেই যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, বীণার কথা মৃন্ময়ের মনেই পড়েনি। ও বড়বাজার থেকে ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জে বদলী হোল কবে। অকারণে মনটা ভারি খারাপ লাগতে

লাগল। কাজে কিছুতেই মন বসল না। অথচ মৃন্ময় অন্যায় কিছু করে নি। এমন অপারেটরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাই উচিত। কিন্তু মনটা কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। হয়তো বীণার এতে ক্ষতি হবে। চাকরি যাবে, কর্তৃপক্ষের ধারণা ওর সম্বন্ধে খারাপ হয়ে যাবে। অবশ্য মৃন্ময়ের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার ওরা করেছে তাতে বীণার শাস্তি হোক, চাকরি যাক তাতে মৃন্ময়ের আফশোষ নেই। কিন্তু একথা মন মানল না। বারবার মৃন্ময়ের মনে হতে লাগল না না এমন শাস্তি সে বীণাকে দিতে চায় না। এমন অনিষ্ট সে বীণার করতে চায় না। কোন অনিষ্ট করবার ইচ্ছাই তার নেই। বীণা যাই করে থাকুক, মৃন্ময় তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

মৃন্ময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন এই কথা ভাবতে ভারি ভালো লাগল আমি এখনও একজনের হিতাকাঙ্ক্ষী। ভাবতে ভালো লাগল ক্ষমা সততা মহত্বের দুএক বিন্দু এখনও নিজের মধ্যে আছে। ভুল করবেন না প্রেম নয়, আপনারা যা নিয়ে ভালোবাসার গল্প লেখেন তা নয়, শুধু হিত শুধু হিতাকাঙ্ক্ষা। আর আশ্চর্য, এ আকাঙ্ক্ষায় জ্বালা নেই। বরং এতদিনের জ্বালার যেন নিবৃত্তি হোল।'

সেই ষ্টীমারে সহযাত্রীদের সঙ্গে সাধারণ সৌজন্য দেখাতে পেরে মৃন্ময় যেমন আত্মপ্রসাদ পেয়েছিল, এ আনন্দও যেন অনেকটা সেই রকম। রূপ, গুণ-হীন একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ায় লজ্জা আছে, কিন্তু করুণা করায় গৌরব। মৃন্ময়

ভাবল ইনচার্জকে ডেকে তার অভিযোগ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু সে বড় হাস্যকর হবে। তারপর মনে করল বীণাদের বাসায় গিয়ে দেখা করে। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারল না। পর দিন একেবারে টেলিফোন অফিসের সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল মৃন্ময়। এর আগে কোন দিন বীণার সঙ্গে এ ভাবে দেখা করতে আসেনি। লজ্জা করত। কিন্তু আজ আর লজ্জা নেই। ফোন অফিস থেকে এক দল মেয়ে বেরিয়ে এল। সব যেন শুকনো, নিষ্প্রাণ। সমস্ত রস রঙ যেন কিসে শুষে নিয়েছে! একজনকে প্রায় বীণারই মত দেখতে। মনে হোল ওদের প্রত্যেককেই বীণা বলে ভুল করা যায়।

ফোন অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে মৃন্ময় অপেক্ষা করতে লাগল। দলে দলে মেয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের মধ্যে বীণা নেই, হয়ত অন্য সিফটে ওর ডিউটি, মৃন্ময় ফিরে যাবে কি না ভাবছে হঠাৎ আরো গুটি তিনেক মেয়ের সঙ্গে বীণাকে তার চোখে পড়ল। দলের মধ্যে বীণাই সবচেয়ে লম্বা। দীর্ঘ একটি বেণী কোমরের নীচ পর্যন্ত পড়েছে। উত্তেজিত ভাবে কি যেন আলোচনা করতে করতে সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে বীণা। মৃন্ময় ওদের পিছনে পিছনে চলল। আর কিছু নয় শুধু একটা কথা মৃন্ময় ওকে জিজ্ঞেস করে যাবে। কালকে বীণার কোন ক্ষতি হয়নি একথা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাবে মৃন্ময়।

ডালহৌসী স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বীণারা ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিল ; মৃন্ময় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে

লাগল। বীণাদের সামনে যাবে কি যাবে না, ওকে ডাকবে কি ডাকবে না। ডাকলে বীণা যদি না সাড়া দেয়, যদি পূর্বের পরিচয়কে স্বীকার না করে বান্ধবীদের সামনে মৃন্ময়কে অপমান করে তাহলে? না অতটা সাহস বীণার হবে না। যদি তেমন দুর্মতি বীণার হয়ই মৃন্ময়ই কি ওকে সহজে ছেড়ে দেবে? সে কি পুরুষ ছেলে নয়? সে কি কোন রকমেই শোধ নিতে পারবে না? অত ভয় কেন মৃন্ময়ের?

এই সময় কালীঘাটগামী একটি ট্রাম এসে দাঁড়াল। বীণার দুজন সঙ্গিনী ভিড় ঠেলতে ঠেলতে উঠল গিয়ে সেই ট্রামে। কলেজ ষ্ট্রীটের আর একটি ট্রাম দেখা যেতেই আর একটি মেয়ের সঙ্গে বীণাও উঠবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে মৃন্ময় একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওর নাম ধরে ডাকল, 'বীণা।'

চমকে উঠে বীণা ওরদিকে তাকাল, হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না।

মৃন্ময় বলল, 'শোন, এ ট্রামটা ছেড়ে দাও পরের ট্রামে যাবে। তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। বীণা অস্ফুট স্বরে বলল, 'কিন্তু আমার তো কোন দরকার নেই. চল রেণু আমরা উঠে পড়ি।'

রেণু মৃদু গলায় বলল, 'মান অভিমানের পালা চলেছে বুঝি? না কি আমি আছি বলে লজ্জা। এ ট্রামে বড় ভিড় বীণা। তুই উঠতে পারবিনে। তোরা পরেরটায় আসিস।'

বলে রেণু ট্রামে গিয়ে উঠল। বীণা উঠবে কি উঠবে না ইতস্তত করতে করতে ট্রামটা ছেড়ে দিল।

মৃন্ময় আরো এগিয়ে এল কাছে, বললো 'শোন তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বীণা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, 'বল।'

মৃন্ময় বলল, 'ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তো সুবিধে হবে না। তার চেয়ে চল পার্কটার মধ্যে যাই।'

একদিকে আত্মাভিমান আর একদিকে কৌতূহল। বীণা একটুকাল ইতস্তত করল। তারপর বলল, 'চল।'

স্কোয়ারের ভিতরে ঢুকে উত্তর দিকে একটু এগিয়ে যেতেই একটা ফাঁকা বেঞ্চ পাওয়া গেল। বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে বীণা বেঞ্চের একপ্রান্তে গিয়ে বসে বলল, 'কি বলবে বল, আমার বেশিক্ষণ সময় নেই।'

মৃন্ময় বীণার দিকে তাকাল। সবুজ পেড়ে সাদা খোলের একখানা মিলের শাড়ি আটসাট করে পরা। সারা দিনের খাটুনির পর মুখখানা একটু যেন শুকনো শুকনো। চেহারায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মৃন্ময়ের মনে হোল তবু যেন কি একটু বদলেছে। ভালো করে লক্ষ্য করতেই মৃন্ময় পরিবর্তন-টুকু বুঝতে পারল। আগে কানে দুটি দুল ছিল এখন তা নেই। মণিবন্ধদুটিও একেবারে শূন্য, প্লাষ্টিকের চুড়ি দুগাছি পর্যন্ত নেই। সেই জন্যেই এত নেড়া নেড়া মনে হচ্ছে। হঠাৎ বুকের মধ্যে কিসের যেন একটু খোঁচা লাগল মৃন্ময়ের। তার

সেই নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর থেকেই কি বীণা তার শেষ আভরণটুকুও ত্যাগ করেছে ?

মৃন্ময় বলল, 'হাতের চুড়ি দুগাছি খুলে ফেলেছ কেন ? চুড়িতে কি দোষ করল ?'

বীণা একটু হাসল, 'খুলে ফেলব কেন ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু এতদিন পরে

এই কি তোমার সবচেয়ে দরকারী কথা ? জরুরী জিজ্ঞাস্য ?'

কাঁচা বাঁশের মত চেহারা বীণার। রঙটা স্নিগ্ধ শ্যামল। কিন্তু ভঙ্গিটা নমনীয় নয়।

মৃন্ময় বলল, 'না আরো আছে। তাবপর চাকরি বাকরি চলছে কেমন ? ইনক্রিমেণ্ট প্রমোশন কি কিছু হোল ?'

বীণা বলল, 'আমাদের ওপরওয়ালাদের অত দাক্ষিণ্য নেই। সেখানে ঘন'ঘন প্রমোশন হয় না।'

মৃন্ময় বলল, 'মিছামিছি ওপরওয়ালাদের দোষ দিচ্ছ। নিজেরা মন দিয়ে চাকরি বাকরি করবে না। সাবসক্রাইবারদের জ্বালাবে। প্রমোশন হবে কেন তোমাদের ? বিশেষ করে তোমার মত অমনোযোগিনী বোধ হয় দুটি নেই।'

বীণা মৃদু হাসল, 'আমার এত গুণের কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?'

মৃন্ময় বলল, 'শুনলুম এক ভদ্রলোকের কাছে। তাঁকে কাল তুমি নম্বর তো দাওনি। তারপর ঝগড়াও করেছ তার

সঙ্গে। তিনিও ছাড়বার পাত্র নন। ক্লার্ক-ইন-চার্জের কাছে দিয়েছেন নালিশ ঠুকে। বল সত্যি বলছি কি না?'

বীণা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি সে কথা জানলে কি করে?'

মৃন্ময় বলল, 'জানলুম। আচ্ছা ধর, সে ভদ্রলোক যদি আমিই হই—'

'ও তুমিই! এবার বুঝতে পারছি। গলাটা তাই অমন চেনা চেনা লাগছিল।'

মৃন্ময় একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা এতে কি তোমার খুব ক্ষতি হবে?'

বীণা মৃন্ময়ের দিকে তাকাল, 'না, যতটা ক্ষতি তুমি করতে চেয়েছিলে ততটা হবে না। চাকরি টাকরি যাবে না। ক্লার্ক-ইন-চার্জ একবার ডেকে হয়ত explanation call করবেন।'

মৃন্ময় স্থির দৃষ্টিতে বীণার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'তুমি এমন একটা কথা ভাবতে পারলে? তোমার চাকরি গেলে আমি খুসি হই?'

বীণা অদ্ভুত একটু হাসল, 'হও না?'

মৃন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, হই। এসব চাকরি বাকরি ছেড়ে বিয়ে থা ক'রে ঘর গৃহস্থালী করতে দেখলে আমি সত্যি খুসি হই বীণা।'

বীণা এবারও হাসল, 'তাই নাকি? শুনে রাখলুম। কিন্তু

জানোতো কুরূপা ফোন অপারেটারের দু'দিনের বন্ধু জোটে চিরদিনের বর জোটে না। তাই আমার ঘর গৃহস্থালী দেখিয়ে তোমাকে বোধ হয় খুসি করতে পারব না। কিন্তু এসব ভণিতা রাখ। যে সুখবরটা শোনাতে এসেছ সেইটা দাও। তোমার বিয়ে কবে?'

মৃন্ময় বলল, 'বিয়ে?'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ বিয়ে। আমার কাছে গোপন করে লাভ নেই। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবার দেখা হয়েছিল। আমরা সব শুনেছি। মানে তিনি সব শুনিয়েছেন।'

মৃন্ময় একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'সবই যদি শুনে থাক তাহলে কথাবার্তা যে কিছুই পাকা হয়নি কেবল আলাপ আলোচনা চলছে তাও নিশ্চয়ই শুনেছ।'

বীণা বলল, 'শুভকাজে আর বিলম্ব করছ কেন? দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেই তো হয়।'

মৃন্ময় বলল, 'হ্যাঁ তা হয়। বিশেষ করে মেয়ে পক্ষের গরজ খুবই বেশি।'

বীণা একটু হাসল, 'আর ছেলে পক্ষের গরজ বুঝি কিছু কম?'

মৃন্ময় বলল, 'না তাও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু একটা কথা ভাবছি। তুমি বিশ্বাস না করলেও কথাটা আমি আজ না বলে পারব না বীণা। কেবল আমিই যে বিয়ে করব ঘর সংসার করব আর তুমি একা থাকবে এতে আমার মন সরছে না।

আমি চাই তুমিও সুখী হও, তুমিও সংসারী হও। আমি বলতে চাই না আমি মহৎ, আমি সাধু-পুরুষ। ভালো বাড়ি, সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী, মোটা মাইনের চাকরি আরো দশজনের মত আমি চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যটাও দেখতে চাই বীণা! দেখ সব নারীপুরুষের সব সময়কার ঘনিষ্ঠতাই বিয়েতে গিয়ে পৌঁছায় না; তা সম্ভবও নয়। জীবনে নানারকম প্রয়োজন নানারকমের কামনাবাসনা আছে। তা মেটাতে হয়, এসো আমিও মেটাই তুমিও মেটাও।'

বীণা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে উঠতে যাচ্ছিল, মৃন্ময় ওর হাত ধরে ওকে বসাল। বীণা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার এত দুঃসাহস তুমি আমাকে ফের ছুঁতে সাহস করছ?' মৃন্ময় বলল, 'হ্যাঁ করছি। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হিসেবে নয়; হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। চিরজীবন প্রণয়ভাজন না থেকেও প্রীতিভাজন থাকা যায়। তোমার বাবার সঙ্গে সেবার যে ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি লজ্জিত। তোমার বাবার কাছে আমি ক্ষমা চাইব। তোমার কাছেও চাইছি। দু'চার টাকা ক'রে আমি কিছু সঞ্চয়ও করেছি। যদি দরকার হয়—তোমার বাবাকে তোমার বিয়ের বাবদ—'

বীণা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, 'এত স্পর্ধা তোমার, এত সাহস। টাকা দিয়ে তুমি আমার ক্ষতিপূরণ করবে? টাকার এত জোর হয়েছে তোমার যে সব ক্ষতি তুমি

তাতে পূরণ করতে চাও? নির্লজ্জ বদমাস কোথাকার।' বকতে বকতে বীণা পার্ক থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এল এবং ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত বাসকে থামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, যেন কোন পরম শত্রু তার পিছু নিয়েছে।

সিগারেট ধরিয়ে মৃন্ময় আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'মেয়েরা আর আপনারা, লেখকেরা একই জাতের। কেউ প্রেম ছাড়া কিছু বোঝেন না।'

অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললাম, 'বোধ হয় তাই। তারপর?'

•

তারপর মৃন্ময়ের রোখ চাপল বীণাকে সে বুঝিয়ে ছাড়বে। সে এখন আর বীণার প্রণয়ী না হ'তে পারে কিন্তু নির্লজ্জও নয়, বদমাসও নয়। আরো পাঁচজনের মত সেও একজন সাধারণ ভদ্রলোক। দু'তিন দিন কোন রকমে কাটল, তারপর মৃন্ময় ভাবল বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনে গিয়ে বীণার বাবার কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে আসবে। কিন্তু বীণার কাছে ক্ষমা চাইবে না। সে নিজের ভুল নিজে বুঝে লজ্জিত হোক। দিন কয়েক বাদে অফিস ছুটির পরে অক্রূর লেনে গিয়ে হাজির হোল মৃন্ময়। সদর দরজা খোলা। সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে বুকের ভিতরটা তার ঢিপ ঢিপ করে উঠল। এ বাড়ির তেতলার ঘরের

একখানি ঘরের দ্বার তার কাছে দেড়বছর আগে যেমন অবারিত ছিল আজ তো তা নেই! আজ গিরীনবাবু তাকে দোরের সামনে দেখলে নিশ্চয়ই সাদর সম্বর্ধনায় এগিয়ে আসবেন না! বাড়িতে পেয়ে বীণা হয়ত আরও জোর গলায় তাকে অপমান করবে! তা করুক! তবু মৃন্ময় গিরীনবাবুকে নিজের বক্তব্য সব বুঝিয়ে বলবে! একদিন উত্তেজিত মুহূর্তে যা ঘটেছে সেইটাকেই চিরদিনের একমাত্র ঘটনা বলে মৃন্ময় মনে রাখতে চায় না। গিরীনবাবুর জামাই হতে না পারলেও তাঁদের পারিপারিক বন্ধু হিসেবেই মৃন্ময় থেকে যেতে চায়। বীণার সে সম্বন্ধ খুঁজে দেবে, তার বিয়েতে অর্থ সাহায্য করবে। দান নয় ধার হিসেবেই গিরীনবাবুকে টাকা দেবে মৃন্ময়, তিনি সুবিধে মত তা শোধ দেবেন। এতে দোষের কি আছে। গিরীনবাবু হয়তো তাকে দেখা মাত্রই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। কিন্তু আজ আর মৃন্ময় ধৈর্য হারাবে না। শান্ত সহিষ্ণুতায় নিজের সৎ উদ্দেশ্যের কথা তাঁকে জানাবে মৃন্ময়, আজ তার ভয় কিসের।

ছোট উঠানের এক পাশে কল চৌবাচ্চা। বিকেলের কাজের জন্যে সারা বাড়ির বউঝিরা জড়ো হয়েছে। কে আগে জল নেবে তাই নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে দুজন আধ বয়সী স্ত্রীলোকের মধ্যে। মৃন্ময়কে দেখে তাঁরা ঘোমটা টানলেন। মৃন্ময় কোনদিকে না তাকিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে সোজা তেতলায় উঠে গেল।

ভিতর থেকে দোর ভেজানো। কারা যেন মৃদু স্বরে কথা বলছে। মৃন্ময় আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল। যে কোন মুহূর্তে রুদ্র মূর্তিতে গিরীনবাবু বেরিয়ে এলেই হয়।

কিন্তু রুদ্র নয়, রুদ্রানীও নয়, এক মোহিনী তরুণীর সঙ্গেই চোখাচোখি হয়ে গেল মৃন্ময়ের। বীণা নয়, মঞ্জু।

'মঞ্জুকে চেনেন?'

মৃন্ময় আমার দিকে তাকাল।

বললাম, 'চিনি বইকি। চমৎকার পান সাজে।'

মৃন্ময় বলল, 'আজ কাল নিজেও খুব সাজতে শিখেছে।'

এই দেড় বছরে মাথায় অনেক বেড়ে গেছে মঞ্জু। স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে। ফিকে গোলাপী রঙের শাড়ি সুন্দর করে পরা। হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি। গলায় এক চিলতে হার। মুখে বৈকালিক প্রসাধনের ছাপ। ওকে দেখে পদ্ম পুকুর রোডের আর একটি মেয়ের মুখ মনে পড়ল মৃন্ময়ের।

তাকে দেখে মঞ্জু একটু কালের জন্যে থমকে গেল। তারপর বলল, 'আপনি।'

মৃন্ময় বলল, 'হ্যাঁ। তোমাদের খোঁজ নিতে এলাম।'

মঞ্জু বলল, 'কি ভাগ্য আমাদের এতদিন বাদে খোঁজ নেওয়ার কথা মনে পড়ল? খোঁজ নিতে এসেছেন না চিঠি বিলি করতে এসেছেন?'

মৃন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'চিঠি? চিঠি আবার কিসের?'

মঞ্জু বলল, 'আচ্ছা, কিছুই যেন জানেন না। প্রজাপতি

মার্কা সোনালী রঙের চিঠি। আমরা সব শুনেছি। চিঠিটা দিন আমার কাছে। আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এর আগে কত চিঠি পৌঁছে দিয়েছি মনে নেই ?'

মৃন্ময় বলল, 'আছে। কিন্তু তুমি যে চিঠির কথা বলছ সে চিঠি এখনো ছাপা হয়নি। প্রজাপতি এখনো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোন চিঠির মাথায় মন স্থির করে বসতে পারেনি। তাছাড়া পরের চিঠির পিওনি করবার দিন কি তোমার আর আছে ? তুমি নিজেই হয়তো এখন কত চিঠির লক্ষ্যস্থল।'

মঞ্জু বলল, 'আহাহা। আসুন ঘরে আসুন। ওঁরা অবশ্য কেউ নেই।'

'তোমার বাবা বুঝি এখনো অফিস থেকে ফেরেননি ?

মঞ্জু বলল, 'না, বাবা আজ অফিসে যাননি। মা আর ছোট ভাই বোনদের নিয়ে শ্যামবাজারে মামাদের বাসায় গেছেন। মেজো মামার ছেলে বিষ্টুর মুখে ভাত।'

মৃন্ময় একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার দিদিও বুঝি গেছে সেখানে ?'

মঞ্জু বলল, 'না দিদি ওসব নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের মধ্যে নেই। তার বিকেলের সিফটে ডিউটি, রাত দশটা পর্যন্ত তো অফিসেই থাকবে।'

মৃন্ময় বলল, 'আর তুমি। তুমি বুঝি দিদির ওপর সহানুভূতিতে—'

মঞ্জু বলল, 'বাঃ আমারতো আজ বাদে কাল পরীক্ষা, আমি কি করে যাব ? ভিতরে আসবেন না ?'

মৃন্ময় একটু হাসল, 'আসতে দিলে তো আসব।'

মঞ্জু আরক্ত হয়ে উঠল, 'বাঃ আসতে দেব না কেন ? আসুন।'

ঘরে ঢুকল মৃন্ময়। দেয়ালে ঠেস দেওয়া ছোট্ট একটি টেবিল। তার ওপর একরাশ বই। টেবিলের সামনে আর ডানদিকে ছুখানি চেয়ার। বড় চেয়ারখানায় বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবক গভীর মনোযোগে মোটা পাটিগণিত খানার পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। কালো ছিপ ছিপে গড়ন। লম্বাটে মুখের ডৌলটি বেশ মিষ্টি। মৃন্ময়কে দেখে একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল।

মঞ্জু বলল, 'আপনি বসুন না। উনি এই চেয়ারে বসবেন। পরিচয় করিয়ে দিই মৃন্ময়দা। আমাদের একই গ্রামের লোক। আর এর নাম দিলীপ দত্ত, এই পাড়াতেই থাকেন। কমার্স পড়েন। এবার ফোর্থ ইয়ার।'

যুবকটিকে ভারি লাজুক মনে হোল। মৃন্ময়ের দিকে চোখ তুলে সে তাকাল না। শুধু হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর মঞ্জুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমি এবার যাই মঞ্জু, একটু কাজ আছে।'

মঞ্জু বলল, 'আচ্ছা, কাজ সেরেই আবার চলে আসবেন কিন্তু। আমার অনেক অঙ্ক বাকি। যে জন্যে নেমন্তন্ন খেতে গেলাম না।'

দিলীপকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এবং মৃদুস্বরে আরো যেন কি বলে মঞ্জু ফিরে এল। মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর কতদিন বাদে এলেন বলুন তো।'

মৃন্ময় বলল, 'কে জানে। বসে বসে দিন গুণবে এমন তো কেউ নেই।'

মঞ্জু কোন জবাব দিল না।

হঠাৎ মৃন্ময়ের চোখে পড়ল বইয়ের টেবিল আর জানালার মাঝখানে যে সাদা দেয়ালটুকু আছে তাতে পেরেক দিয়ে এক-খানা আবাঁধানো ছবি আটকে রাখা হয়েছে। ছবি মানে সাদা কাগজের উপর পেনসিল স্কেচ একটি নারী মূর্তি। তার সঙ্গে বীণার মুখের আদল আছে। অথচ পুরোপুরি বীণার পোরট্রেটও তাকে ঠিক বলা যায় না।

মৃন্ময় বলল, 'এ আবার কি। তুমি কি ছবি আঁকাও প্র্যাকটিস করছ নাকি?'

মঞ্জু বলল, 'বাঃ আমি ছবি আঁকতে যাব কোন্ দুঃখে। আমাদের ছবিই আর্টিষ্টরা এঁকে কূল পায় না।'

মৃন্ময় বলল, 'তা বটে। তোমার এই দিদির ছবিটি অকূলে পড়ে কোন আর্টিষ্ট এঁকেছেন?'

মঞ্জু মুখ টিপে হাসল, 'আগে বলুন তো ছবিখানি কেমন হয়েছে?'

মৃন্ময় বলল, 'ভালোইতো।'

মঞ্জু বলল, 'ভালো মানে দিদির আসল চেহারার চেয়ে

অনেক ভালো। দিদি নিজে সেটা বিশ্বাস করে না। ছবিটা তো সে ফেলেই দিয়েছিল আমি কুড়িয়ে এনে টাঙিয়ে রেখেছি।'

মৃন্ময় বলল, 'বুদ্ধিমতীর কাজই করেছ। এবার আর্টিষ্ট মশাইর নামটি শুনি।'

মঞ্জু বলল, 'কেন নাম টাম শুনে কি করবেন? নিজের ছবি আঁকাবেন নাকি? একার না যুগলের?'

মৃন্ময় বলল, 'সেটা যা হয় তোমার পরামর্শ নিয়ে করব। আর্টিষ্টটি কে?'

মঞ্জু বলল, 'বিমল মুখুয্যে। দিদির বন্ধুর দাদা।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।'

মৃন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'অনুমান করেছিলেন মানে? বিমল মুখুয্যের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি?'

বিমলের সঙ্গে যে একবার আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল তা মৃন্ময়কে জানালাম। পরিচয়ের উপলক্ষটাও গোপন করলাম না। শুনতে শুনতে মৃন্ময়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে মৃন্ময় বলল, 'তাই বলুন। আর্টিষ্টের বাড়িতে মডেলটির রোজই তাহলে আনাগোনা চলে।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'আর্টিষ্টের সঙ্গে বীণা দেবীর খুব যোগাযোগ আছে বলে তো মনে হয় না। তাঁর কলীগের চিকিৎসার জন্যেই—'

মৃন্ময় বাধা দিয়ে বলল, 'থামুন মশাই থামুন। কিসের জন্যে যে কে কোথায় যায় তা আমাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। সেটুকু বোঝবার বয়স আমার হয়েছে। মেয়েদের নাড়ি নক্ষত্র চিনতে আমার আর বাকি নেই। আপনাদের মত গল্প কবিতা না লিখলে কি হবে—'

বললাম, 'তাতো বটেই। গল্প কবিতা যারা লেখে তারা মানুষকে গল্পের ভিতর দিয়ে দেখে, তারা মানুষকে গল্পের ভিতর নিয়ে দেখে। আসল মানুষের সন্ধান তারা রাখতে জানলে তো। এসব ব্যাপারে আপনারাই খাঁটি জহুরী। যাকগে, মঞ্জু আর কি বলল বলুন!'

মৃণ্ময় বলল, 'বলবে আবার কি। সে আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত। তার অঙ্ক কষার সময় বয়ে যায়। খানিক বাদেই উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি মঞ্জুর অঙ্কের মাষ্টার শ্রীমান দিলীপ সিগারেট ধরিয়ে গলির মুখে পায়চারি করছেন। তার জরুরী কাজের নমুনাটা এবার দেখলেন তো। ম্যাট্রিকের জন্যে মঞ্জুর প্রিপারেশনটাও নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন! আপনার আর এক গল্প তৈরী হচ্ছে আর কি, সেই পুরাণো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মৃণ্ময় একটু হাসল, 'আর দু'চার মাস সবুর করুন। দেখবেন মঞ্জু আর দিলীপকে নিয়েও দিব্যি এক গল্প খাড়া করতে পারবেন।'

হেসে বললাম, 'এক এক জোড়া মানুষকে নিয়ে কেবল একটি কেন এক হাজার গল্প খাড়া করা যায়। কিন্তু কটি গল্পই

বা চোখে পড়ল আর কটি গল্পই বা ধরা পড়ল কলমের মুখে।'

মৃন্ময় বলল, 'রক্ষে করুন, আর বেশি ধরা পরে কাজ নেই। যা লিখেছেন তার চোটেই আমরা অস্থির।'

কীর্তিকাকাদের প্রসঙ্গটা আর বেশি এগুলো না। আমি নিজেও স্পষ্ট ক'রে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। মনে হোল জিজ্ঞেস করলেও মৃন্ময়ের কাছ থেকে সদুত্তর মিলবে না।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মৃন্ময় হঠাৎ বলল, 'ভালো কথা, আপনাদের বিখ্যাত আর্টিষ্টটির সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দিন না।'

আমি মৃন্ময়ের দিকে তাকালাম, 'কেন, নিজের ছবি আঁকাবার সখ হয়েছে নাকি?'

মৃন্ময় হেসে বলল, 'হ্যাঁ ছবির যা নমুনা দেখলুম তাতে নিজের একখানা অয়েল পেইন্টিং না করালেই নয়। ভদ্রলোক জন্মেও কোনদিন ছবি আঁকতে পারবেন না।'

বললাম, 'কি করে বুঝলেন।'

মৃন্ময় বলল, 'আমার ছ সাত বছরের ভাগ্নে ঘরের কপাটে চকখড়ি দিয়ে ঘোড়া আঁকে পাখী আঁকে। তার হাতের লাইনগুলিও আপনাদের এই পাশকরা নামকরা আর্টিষ্টের চেয়ে অনেক সোজা, অনেক স্পষ্ট। তার ঘোড়াকে ঘোড়া বলেই মনে হয়, গাধা বলে ভুল হয় না।'

বললাম, 'কেন বিমলবাবুর আঁকা বীণাদেবীকে কি বীণা দেবী বলে চেনা যায়নি ?

মৃন্ময় বলল, 'বীণা দেবীর ক্যারিকেচার বলে চেনা গেছে। কিন্তু কেউ কেউ বোধ হয় নিজের ক্যারিকেচারকেই ভালোবাসে। নইলে ওই ছবি কি কেউ ঘরে টাঙিয়ে রাখে ?'

বললাম, 'ওটা বোধ হয় মঞ্জুই ঠাট্টা করে রেখেছে। কিন্তু বিমলবাবুর আঁকা যখন আপনার পছন্দই হয়নি তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান কেন।'

মৃন্ময় বলল, 'কেন আবার, এমনিই একটু চিনে রাখতাম।'

বললাম, 'কিন্তু চেনাশোনা তো আমার চেয়ে বীণা দেবীর সঙ্গে তাঁর বেশি। আপনি বললে তিনিই হয়ত আপনাদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন।'

মৃন্ময় আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকাল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে তো রাত্রে ঘুম হচ্ছে না আমার। আপনি যেমন। আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

আমি সারল্যের ভঙ্গি করে বললাম, 'তাই নাকি ? আমি ভাবলাম বুঝি সত্যি !'

মৃন্ময় রাগ ক'রে বলল, 'কি ক'রে আপনি তা ভাবতে পারলেন ? আশ্চর্য, আমি এর আগেও লক্ষ্য করেছি আপনি ঠাট্টা তামসাটা মোটেই বোঝেন না। আপনার লেখার মধ্যে

রস কতটুকু আছে রসিকেরাই জানেন, কিন্তু জীবনে রসিকতার ধার যে ধারেন না তা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

মৃদু হেসে আর একবার ত্রুটি স্বীকার করে এবার সত্যিই বিদায় নিলাম।

কীর্তিকাকাদের বাসায় নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া অবশ্য সেবার আর হোল না। ওঁদের বাড়ির পলান্নে মিষ্টান্নে আমার অবশ্য লোভ আছে। কিন্তু দুর্মুখের ভূমিকা নিয়ে মিষ্টিমুখ করতে যাওয়ায় ভয়ও কম নেই!

আমাদের ষ্টাফ কার্টুনিষ্ট নকুল সেনের পাল্লায় পড়ে সেদিন চৌরঙ্গীর এক আর্ট একজিবিশনে যেতে হয়েছিল। আমি অবশ্য বললাম, 'আমার একটু কাজ আছে।' কিন্তু নকুল নাছোড়বান্দা। ও আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'আরে চল, একা একা যেতে ভালো লাগছে না।' আর্টের চেয়ে আর্টিষ্টের টান কম মারাত্মক নয় একথা স্বীকার করতে হোল।

ছোট একজিবিশন। একদল তরুণ আর্টিষ্টের আঁকা সব ছবি। নকুল বলল, এরা এক বিশেষ দলের গ্রুপের। কয়েকজন এখনো আর্ট স্কুলের চৌকাঠ পার হয় নি। কিন্তু এদের অনেকের মধ্যেই নাকি দারুণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

একজিবিশনে মোটেই ভিড় ছিল না। দর্শনার্থীদের সংখ্যা বিশ পঁচিশের বেশী হবে না। তাদের বেশীর ভাগই আর্ট স্কুলের ছাত্র ছাত্রী। বহিরাগত দু'চার জন প্রৌঢ়ও অবশ্য এসেছেন। কিন্তু তাঁদের বাঁকা দৃষ্টি তরুণ শিল্পীদের হাতে আঁকা ছবির চাইতে তরুণী শিল্পানুরাগিণীদের দিকেই বেশি নিবদ্ধ বলে মনে হোল।

বার দুই টহল দিয়ে নকুল নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে বলল, 'না আসেনি। চল। আসবেনা জানতাম।'

হেসে বললাম, 'ও, তুমিও তাহলে আর এক জনের আশায় এসেছ।'

নকুল বলল, 'হ্যাঁ, একজন বন্ধুর আসবার কথা ছিল। কটা টাকা পেতাম তার কাছে। কিছু দেবে বলেছিল। কিন্তু দেখাই নেই—। চল যাওয়া যাক!'

মোড়ের কাছে আসতে না আসতেই নকুল সোল্লাসে বলে উঠল, 'এই যে বিমল। তোমার জন্য বসে থেকে থেকে আমি চলে যাচ্ছিলাম। এই বুঝি তোমার সাড়ে চারটা?'

'একটু দেরি হয়ে গেল।'

'একটু মানে এক ঘণ্টা। তোমার ছবিগুলি কিন্তু এবার বেশ ভালো হয়েছে। রোগিনী নামে ওই ছবিখান তো বিক্রিও হয়েছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ হয়েছে। নাম মাত্র দামে। এই নাও তোমার টাকা।'

পাঁচখানা দশ টাকার নোট নকুল গুণে নিতে নিতে বলল, ‘একি, সবই দিয়ে দিলে যে। আমার কিন্তু এত এখন না হলেও হোত। ভারি দরকার পড়েছিল, তাই চাইতে হোল। রাগ করলে না তো?’

‘ধার শোধ করার সময় খাতকের একটু একটু রাগ হয়ই, তাতে মহাজনের কিছু এসে যায় না।’

নকুল একটু হাসল, ‘তুমি ঠিক সেই রকমই আছো। এসো পরিচয় করিয়ে দিই—’

বলে নকুল আমার দিকে ফিরল।

হেসে বললাম, ‘আমাদের পরিচয় আছে।’

বিমল আমার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল, ‘আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।’

বললাম, ‘আপনাদের বাসায়। কমলা—কমলা দেবী কেমন আছেন আজকাল?’

বিমল সংক্ষেপে বলল, ‘নেই।’

বললাম, ‘সে কি!’

নকুলও বলে উঠল, ‘তোমার বোন মারা গেছে নাকি? কবে মারা গেল?’

বিমল বলল, ‘সপ্তাহখানেক। আচ্ছা চলি এবার নকুল। আর এক সময়ে দেখা হবে।’

বিমল আর দেরী না করে ভিতরে ঢুকল।

আমরা দু’জনেই মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে

রইলাম। মনে পড়ল কমলাকে আর এক দিন দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। সে তার কটা ছেঁড়া কবিতা তখন দেখায় নি। সুন্দর করে নতুন করে লিখবে এই ছিল তার আশা। মৃত্যু কি সে সময় তাকে দিয়েছিল? দেখা হলে বীণাকে কমলার খাতাটার কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।

নকুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার, তুমি চিনতে কমলাকে?'

যেভাবে যতটুকু পরিচয় কমলার সঙ্গে হয়েছিল সে কথা নকুলকে জানালাম। না যাওয়ার অনুতাপটুকুও স্বীকার করলাম।

নকুল বলল, 'অনুতাপের আমারও অবশ্য কারণ আছে কিন্তু আমি কেবল উপলক্ষ ছিলাম।'

বললাম, 'ব্যাপারটা কি। কিসের উপলক্ষ।'

নকুল বলল, 'কমলা যে তার স্বামীর সঙ্গে বাস করতে পারল না তার নিমিত্ত এক হিসাবে আমাকেই বলা যায়।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি! কমলা তো কুমারী ছিল। ওর আবার স্বামী আসবে কোত্থেকে।'

নকুল বলল, 'ও, তোমার কাছে বুঝি ওরা তাহলে সব কথা চেপে গেছে। অবশ্য তোমার সঙ্গে ওদের পরিচয়ই বা কতক্ষণের। কিন্তু বিষয়টা যখন চাপা আছে, চাপাই থাক। সে কাহিনী আর খুঁড়ে তুলে লাভ কি। বিশেষ করে কমলার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সব শেষ হয়ে গেছে।'

বললাম, 'সব আর শেষ হোল কই। তোমার মধ্যে এখনও তো কিছু রয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি।'

একটু পীড়াপীড়ির পর যেতে যেতে নকুল আমাকে কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বলছিল।

ম্যাট্রিক পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যায় কমলার। ওর স্বামীর নাম ছিল বিনয় বাঁড়ুয্যে, বিধবা মা আর তিন চারটি ভাইবোন নিয়ে ছোট সংসার। বিনয় কাজ করত কি একটা মার্চেণ্ট অফিসে। মাইনে যে তেমন বেশী ছিল তা নয়, তবু মার পীড়াপীড়িতে বিয়ে করে বসল। অবশ্য কমলাকে দেখে নিজেরও পছন্দ হয়েছিল। বিয়ে হওয়ার কিছু দিন পরেও সে পছন্দের মাত্রাটা ক্রমেই চড়ে যাচ্ছিল। নানা ছল ছুতোয় অফিস কামাই করত, অফিসে যেত দেরি ক'রে। কমলাই যে এর কারণ সে সম্বন্ধে পরিবারের কারো সন্দেহ ছিল না। এসব অনিয়ম কর্তৃপক্ষ বেশি দিন সহ্য করলেন না। অফিসে মাঝে মাঝে ছাঁটাই চলছিল। বিনয়ও তার মধ্যে পড়ে গেল। পরিবারের সবাই দোষ দিল কমলাকে, মনে মনে বিনয়ও যে বিব্রত না হোল তা নয়। চাকরির চেষ্টা চলল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু চেষ্টা করলেই তো আর চাকরি জোটে না।

কমলা বলল, 'আমিও যা হয় কিছু একটা করি।'

সংসারের অবস্থা ভালো নয়, তাছাড়া মার গঞ্জনা প্রায়ই শুনতে হয়।

বিনয় বলল, 'কর।'

খবরের কাগজ খুলে দুজনে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আর দরখাস্ত পাঠায়, কিন্তু কোন দরখাস্তেরই জবাব আসেনা।

অবশেষে কমলা একদিন এসে বলল, তার কোন এক প্রতিবেশিনী বান্ধবী টেলিফোনে কাজ করে। সেখানে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারে।

কিন্তু তখন কাজকর্মে অসুবিধা হয় এই অজুহাতে বিবাহিতা মেয়েদের টেলিফোনে নেওয়া হতনা। কমলা বলল, তাতে কি, কুমারী হতে কতক্ষণ লাগবে। তার বান্ধবী বলেছে চাকরির জন্য এমন কুমারী নাকি অনেকেই সাজে। চাকরি হয়, শেষে দু এক সপ্তাহ বাদে বিয়ের জন্য দু'তিন দিনের ছুটির দরখাস্ত করে। ছুটি শেষ হ'লে সিঁথিতে ফের সিঁদুর পরে অফিসে চলে আসে। কোন গোলমাল হয় না।

কমলা বলল, 'আমিও তাই করব।'

একটু ইতস্তত ক'রে বিনয় রাজী হয়ে গেল। এই সুযোগে টেলিফোন অফিসকে ধাপ্পা দিয়ে বিনা খরচায় একটু কৌতুক করা যাবে একথাও দু'জনে বলাবলি করল।

চাকরি হোল। সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেলে কুমারী সেজে পিঠের উপর বেণী দুলিয়ে কমলা অফিসে যেতে সুরু করল। শাশুড়ী রাগ করলেন, 'এসব কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড। সধবা বউঝি আবার সিঁথির সিঁদুর তোলে নাকি।'

কমলা বলল, 'কদিন বাদেই আবার পরব মা।'

দিন কয়েক বেশ লাগল বিনয়ের। একটু একঘেঁয়ে

হয়ে আসছিল কমলা। কিন্তু কুমারীর বেশ ওকে ফের যেন নতুন রূপ দিয়েছে। এ যেন বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম নয়, অবিবাহিতার সঙ্গে পূর্ব প্রণয়।

বিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখে কমলা একদিন বলল, 'এমন যদি প্রায়ই দেরি করিয়ে দাও, আমার চাকরি থাকবে না।'

বিনয় বলল, 'না থাকল, তোমার জন্য আমার চাকরিও তো থাকেনি।'

কমলা বলল, 'কথাটা মিথ্যা। আমি তোমাকে এমন করে বাধা দিতাম না। এক সঙ্গে দু'জনের চাকরিই যদি না থাকে তাহলে খাব কি।'

বিনয় গম্ভীর হয়ে গেল। মেয়েরা বড় বেশি

চেষ্টা চরিত্র খোঁজ খবরের পর বিনয় একটা ইনসিওরেন্স অফিসে চাকরি পেয়ে গেল। মাইনে আর এ্যালাউন্স নিয়ে কমলার চেয়ে দশ পনের টাকা বেশিই পায়। বিনয় বলল, 'আর তোমার কষ্ট করে দরকার নেই। চাকরি ছেড়ে দাও।'

কিন্তু কমলা তখন টাকা রোজগারের স্বাদ পেয়েছে। স্বাদ পেয়েছে স্বাবলম্বনের। সে বলল, 'এখনই ছেড়ে দিলে চলবে কি ক'রে।'

বিনয় বলল, 'আগে তো চলত। আগে তো শুধু আমার আয়েই চলত সংসার।'

কমলা বলল, 'আগের কথা ছেড়ে দাও। কিভাবে চলত,

কিভাবে চালাতাম তা তো আমার অজানা নেই। চিরকালই কি আমাদের একই রকম যাবে নাকি। দুজনে মিলে যদি খাটি, ভালো খাব, ভালো পরব, হয়তো দু'চার টাকা জমাতেও পারব।'

কিন্তু ভবিষ্যতের এই সুখ সম্ভাবনায় বিনয় মোটেই প্রসন্ন হোল না। সংসারে তার রোজগারটাই যে যথেষ্ট নয়, শুধু তার রোজগারেই কমলার যত সুখস্বাচ্ছন্দ্য মেটে না, তার খাওয়া পরার তৃপ্তি হয় না, স্ত্রীর মুখের এই সহজ স্বীকৃতি বিনয়ের মোটেই ভাল লাগল না। ভিতরে ভিতরে সে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হোল এমনকি অপমান বোধ করল। খিটিমিটিটা এই নিয়েই বাঁধল। বিনয়ের বাঁধা সময়ের চাকরি। অফিস টাইম দশটা পাঁচটা। কিন্তু কমলার তো তা নয়। তারতো সময়ের ঠিক নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে তার সময় বদলায়। কখনো সকালে কখনো দুপুরে, কখনো বিকেলে। কখনো সারা রাত ভোর করে গোপন অভিসারিকার মত দুই চোখের কোণে কালি নিয়ে ফিরে আসে বাসায়। বিনয়ের বুক জ্বলে যায়। কখনো কখনো তার যখন অফিসে যাওয়ার সময় হয় কমলা তখন বাসায় ফেরে। যাতায়াতের পথে দুজনের সঙ্গে সদর দরজায় দেখা হয়। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা হয় না, মনের দরজা বন্ধ থাকে। একেকদিন বিনয় বলে, 'তুমি ও চাকরি ছেড়ে দাও, তোমাকে অন্য কাজ জুটিয়ে দিচ্ছি।'

কমলা বলে, 'বেশতো আগে কিছু একটা জুটুক। তারপরে ছাড়ব।'

বিনয় চটে উঠে বলে, 'কেন, তুমি নিজে চাকরি না করলে কি তোমার ভাত জুটবে না?'

কমলাও কড়া জবাব দেয়, 'জুটবেনা কেন, জুটবে। কিন্তু তা গলা দিয়ে নামবে না। ভাততো কুকুর বেড়ালেরও জোটে।'

দিন কয়েক কথা বন্ধ থাকে। কিন্তু বিনয়ের ভারি খালি খালি মনে হয়। রান্নাবাড়াটা বেশির ভাগ বিনয়ের মা'ই করেন। বিশেষ করে সকালে ডিউটি থাকে কমলার, তখন তো সে রান্নাঘরে শুদ্ধু যেতেই পারে না। হাত মুখ ধুয়ে কোন রকমে চায়ের কাপটি শেষ ক'রে ছোটে অফিসে। বিনয় দেখে খাওয়ার সময় স্ত্রী কাছে নেই। বুড়ি মা বসে বসে বক বক করছেন, আর স্ত্রীর নামে নালিশ করছেন। কমলার সঙ্গে নাকি কথা বলবার জো নেই। যেমন হয়েছে মেজাজ তেমনি হয়েছে তার মুখ। বিয়ে দিয়ে তো ভারি সুখ হয়েছে কাত্যায়নীর। এই বয়সে নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হয়, সকাল সন্ধ্যা হেঁসেল ঠেলতে হয়। আর ঘরের বউ সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। পাড়ার লোকে ছি ছি করছে। বিনয় যদি তার বউকে সামলাতে না পারে তিনিও আর সংসার সামলাতে পারবেন না।

বিনয় চটে উঠে বলে, 'বেশ তো না পার ছেড়ে দাও। চলে যাও যার যেখানে খুসি, আমার কারোরই দরকার নেই।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কমলার সঙ্গে দেখা হলে বিনয় বলল,

'কাল থেকেই তোমার সকাল বেলার ডিউটি বদলে নিতে হবে।'

কমলা বলল, 'এইতো সবে নতুন সপ্তাহের সুরু হোল। এ সপ্তাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিউটির বদল হবে না।'

বিনয় হুকুম দিয়ে বলল, 'আলবৎ হবে। যেমন ক'রে পার ডিউটি বদলে নাও। সংসারের কাজকর্ম, সকালের রান্না বান্না সেরে যদি সময় পাও তো চাকরি করো, না হলে কোরো না, এই বয়সে মা হাত পুড়িয়ে রাঁধবেন আর তুমি চাকরি করবে সে চাকরি আমি চাইনে।'

কমলা বলল, 'সত্যি আমি সে কথাও ভেবে দেখেছি। মার খুব কষ্ট হয়। ভেবেছি সামনের মাস থেকে একটি কমবাইনড হ্যাণ্ড রাখব। খোরাকী আর টাকা দশেক মাইনে দিলেই বোধ হয় পাওয়া যাবে। আমি খোঁজে আছি। অফিসের অনেক মেয়েকে বলেও রেখেছি।'

বিনয় বলল, বয়ে গেছে আমার ঝি চাকরের হাতের রান্না খেতে। আমি তাহলে অন্য ব্যবস্থা করব।'

কমলা একটু হেসে বলল, 'কি ব্যবস্থা করবে? বিয়ে করবে নাকি আর একটা?' তারপর নিজের মনেই বলল, 'অত সোজা নয়।'

পরের সপ্তাহেও তার সকালে ডিউটি পড়তে যাচ্ছিল কমলা চেষ্টা করে বদলে নিল। সুপারভাইযার বললেন, 'তাহলে কিন্তু নাইট ডিউটি নিতে হবে।'

কমলা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ, তাই দিন।'

কিন্তু নাইট ডিউটিতেও বিনয়ের মনে শান্তি নেই, রাত্রে শুতে এসে দেখে বিছানার অর্ধেকটা খালি পড়ে আছে। মনের যেন সবখানি। মোটা পাশ বালিশ বুকে জড়িয়ে ধরেও সুখ আসেনা। কেবল এপাশ ওপাশ করে। পাশের ঘরের ভাড়াটে সনৎ নতুন বিয়ে করেছে। তাদের আলাপের শব্দ শোনা যায়, আরো নানা রকমের পরিচিত শব্দ কানে আসে। বিনয়ের বুকের ভিতরটা জ্বলে যেতে থাকে। এই সুখ তো তারও ছিল, কেবল কমলার স্বেচ্ছাচারিতায় এর ব্যাঘাত ঘটেছে। সংসারে টাকাটাই কি সব। খাওয়া পরাটাই কি সবখানি? তার চেয়ে কি তুজনের মনের শান্তি তুজনের দেহের স্বাচ্ছন্দ্য বেশি নয়?

পরদিন অফিস থেকে ফিরে এলে বিনয় কথাগুলি স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলল।

কমলা বলল, 'কি করব বল। আমারও কি ভালো লাগে, যতটুকু সময় ঘুমাবার জন্যে পাই আমারও কি ঘুম আসে? কিন্তু উপায় কি চাকরির নিয়ম মেনে চলতেই হবে।'

বিনয় বলল, 'না, হবে না। বিবাহিত জীবনের পক্ষে এ একটা ঘোর অনিয়ম। তুমি ও চাকরি ছেড়ে দাও। তোমার টাকার দরকার, আমি যে ভাবে পারি তোমাকে টাকা এনে দেব। আগের মত তুইটে টুইশন করব ইনসিওরেন্সের দালালী করব, তাতেও যদি না কুলোয় চুরি বাটপাড়ি করব। তবু

ঘরের বউ ঘরে থাক। টাকা টাকা করে তোমার মন শক্ত হয়ে গেছে। টাকা রোজগার করতে গিয়ে তোমার হাতে কড়া পড়েছে। আমি তা চাইনে। I want a woman—womanly woman.'

রাগে আর অপমানে কমলার মুখখানা টক-টক করতে লাগল্। স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কমলা ঝাঁকালো গলায় জবাব দিল, 'কিন্তু চাইলেইতো তা পাওয়া যায় না। চাইলেই তো তা দেওয়া যায় না। মেয়েরাও আগে মানুষ তারপরে মেয়ে মানুষ।'

এর দু' তিন দিন পর ফের আবার ডিউটি বদলাবার প্রসঙ্গ তুলল বিনয়। কিন্তু কমলা বলল, সপ্তাহ শেষ না হলে সে তা বদলাতে পারে না। বিনয় বলল, 'তা হলে কামাই কর, ছুটি নাও। আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জোগাড় করে দেব।'

কিন্তু কমলা তাতেও রাজী নয়। নাইট ডিউটিতে কামাই করলে অফিসে ইমপ্রেশন খারাপ হবে, চাকরির রেকর্ডে কালো দাগ পড়বে।

কমলা বলল, 'তা ছাড়া রাত্রে একসঙ্গে থাকলেই বা লাভ কি, থাকলেই তো ঝগড়া। দিন ভরে তুমি যে ব্যবহার আমার সঙ্গে কর, রাত্রেও তো তাই করবে।'

বিনয় বলল, 'ও সেই জন্যেই তুমি এমনি এড়িয়ে চলতে চাও? বাইরে বাইরে থাক?

কমলা বলল, 'থাকিই তো। দিনে যে স্বামী ভদ্র ব্যবহার করে না, ভালবাসে না, তার রাত্রির ভালোবাসায় আমার বিশ্বাস নেই।'

বিনয় বলল, 'বটে।'

কমলা মনে মনে ঠিক করল পরের সপ্তাহে কর্তৃপক্ষকে বলে কয়ে সে দশটা পাঁচটার অফিস ডিউটিই নেবে। তাহলে দুবেলা স্বামীর খাওয়ার সময়েও থাকতে পারবে, ঘুমের সময়েও। একদিনেই বেশ শিক্ষা হয়েছে বিনয়ের। তার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে তার সমস্ত খিটিমিটি, সমস্ত রাগারাগি চটাচটির মানে বুঝতে পারে কমলা আর মনে মনে হাসে। ওই একটি ব্যাপারে পুরুষেরা বড় দুর্বল। মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কিন্তু পুরুষেরা তা নয়। একটু দেরি হলে তারা একেবারে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে। তাদের মোটে সবুর সয় না। ধৈর্য বলে কোন গুণবাচক বিশেষ্য তাদের অভিধানে নেই, এই নাকি তাদের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু পরের সপ্তাহ এসে পৌঁছবার আগেই এক কাণ্ড ঘটে গেল। যুগবার্তা কাগজের রবিবারের সাপ্লিমেণ্টে বেশি করে কার্টুন দিতে হয়। অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বরাদ্দ মত ছবি নকুল আগে দিয়ে উঠতে পারে নি। তাই অফ ডে'র দিনটিতে ও রাত নটা পর্যন্ত বাড়িতে খেটে ছবিগুলি শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি কাগজের অফিসে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কলেজ

ষ্ট্রীটের মোড়ে কমলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একা একা দ্রুত পায়ে কোথায় যেন যাচ্ছে কমলা। সেও নকুলকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে তৎক্ষণে থেমে দাঁড়িয়েছে।

নকুল বলল, 'একি তুমি যে। এত রাত্রে কোথায় চলেছ।'

কমলা মৃদু হেসে বলল, 'এই আসি একটু বেরিয়ে টেরিয়ে।'

নকুল বলল, 'এই বুঝি বেড়াবার সময়।'

তাছাড়া কমলার বেশবাস দেখে নকুল অবাক হয়ে গেল। কমলার সামনের সিঁথিতে সিন্দুর নেই, পিছনে দীর্ঘ বেণী ঝুলছে, ব্যাপার কি ? এই বছর দুয়েক আগেই তো নকুল ওর বিয়ের নিমন্ত্রণে লুচি মাংস খেয়ে এসেছে। হঠাৎ কমলা এমন আনকোরা কন্যা কুমারী বনে গেল কি করে।

ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে কমলাও একটু অপ্রতিভ হল, তারপর মৃদু হেসে ধীরে ধীরে রূপান্তরের কারণটা জানাল নকুলকে।

নকুলও হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'যাই বল, বধূর চেয়ে তোমাকে কিন্তু কুমারী বেশেই মানিয়েছে ভালো।'

নকুল আরও কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ পিছন থেকে আর একটি পুরুষের রূঢ় পরুষ কণ্ঠ কানে এল, 'এসব আলাপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে করলে ভিড় জমবে। তার চেয়ে কোনএ কটা রেঁস্তরা টেস্তরায় যাও।'

দুজনেই চমকে উঠে দেখল বিনয়। নাইট ডিউটির সময় এর

আগে বিনয় মাঝে মাঝে স্ত্রীকে এগিয়ে দিয়ে আসত, কদিন ধ'রে দুজনের মধ্যে মন কষাকষি চলছে বলে বিনয় এবার আর সঙ্গে আসেনি। কিন্তু গোপনে গোপনে স্ত্রীর যে অনুসরণ করেছে তা দেখে কমলা অপমানে আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

নকুলের অফিসের তাড়া ছিল। সে আর কোন কথা না বলে ট্রাম ধরলো।

বিনয় বলল, 'আজ তুমি কিছুতেই অফিসে যেতে পারবে না। অফিসে গিয়ে তো এই কর। নাইট ডিউটি তো এমন রাস্তায় রাস্তায় দিতে দিতেই চল।'

কমলা বলল, 'যা তা বলো না। তা ছাড়া যা বলবার বাড়িতে বলবে। রাস্তার মধ্যে এসব কি।'

বিনয় বলল, 'রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি যদি অন্যের সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পার আমারও তাহলে শাসন করবার অধিকার আছে। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার ঘর-সংসারে মন লাগে না, এখন বুঝতে পারছি নাইট ডিউটির আসল রস কোথায়। চল ঘরে চল।'

কিন্তু রাগে অপমানে কমলার মনও তখন জ্বলে যাচ্ছে। সে স্বামীর নির্দেশ মেনে ঘরে তো গেলই না, তখনকার মত তার হাত এড়াবার জন্যে একটা চলন্ত বাস থামিয়ে উঠে বসল। অন্যান্য যাত্রীরা কৌতূহলী মুখ বাড়াল জানলা দিয়ে। আর অপমানিত বিনয় বোকার মত পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইল।

পরদিন সকাল সাতটায় ঘরে ফিরল কমলা। বিনয় অফিসে বেরোলনা। আগের রাত্রের জের টেনে সারা দিন ভর ওদের ঝগড়া চলতে লাগল। তারপর এল কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সারাদিন কমলা নায়নি খায়নি। কিন্তু অফিসের সময় হতেই বেরবার জন্যে সে তৈরি হতে লাগল।

বিনয়ের আক্রোশ ফেটে পড়ল, চড়া গলায় সে বলল, 'তুমি যেতে পারবেনা।'

কমলা বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।'

বিনয় শোয়ার ঘরের দোর বন্ধ করে স্ত্রীব মুখোমুখি দাঁড়াল, বলল, 'যেতেই হবে?'

কমলা বলল, 'হ্যাঁ।'

হঠাৎ বিনয়ের চোখে পড়ল কমলার সিঁথিতে কুমারীর শুভ্রতা। আঁট শাট করে পরা শাড়ি। হ্রস্ব আঁচল ব্রেসিয়ারবদ্ধ সমুচ্চ স্তনযুগ। পিঠের উপর লুটানো সর্পিল বেণী। সর্প যেন বিনয়ের মর্মদেশে ছোবল মারলো। সেই আগের রাত্রের অভিসারিকার বেশ। যে বেশ দেখে নকুল মুগ্ধ হয়েছিল।

বিনয় বলল, 'যদি যেতেই হয় ভদ্রলোকের বউরের মত যাও। সিঁথিতে সিঁদুর পর হাতে শাঁখা। তারপর আমি তোমাকে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।'

কমলা বলল, বিশ্বাস না হয় অফিসের দোরগোড়া পর্যন্ত তুমি আসতে পার আমার সঙ্গে, কিন্তু শাঁখা সিঁদুর পরে আমি আজই বেরুতে পারব না।'

বাড়িতে শাশুড়ীর মনস্তুষ্টির জন্যে নেয়ে এসে সিঁথিতে অল্প একটু সিঁদুর ছোঁয়ায় কমলা। কিন্তু অফিসে বেরুবার সময় ভিজে গামছায় সাবান মেখে সযত্নে সেই সিন্দুরের রক্ত আভাস ঘষে ঘষে সিঁথি থেকে কমলা তুলে ফেলে যায়। আজ সাবা দিন ঝগড়া ঝাটি চলেছে। আজ সে সিন্দুর একেবারে ছোঁয়ায়নি।

বিনয় বলল, 'তোমাকে সিঁদুর আজ পরতেই হবে।'

কমলা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল তা হয় না। হঠাৎ এক কপাল সিন্দুর মেখে অফিসে গেলে লোকে হাসাহাসি করবে। কারণ কমলাকে কুমারী বলেই সকলে জানে। তাই লোক দেখাবার জন্যে কমলাকে বিয়ের অজুহাতে ছুটি নিতে হবে। তারপর দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়ে থেকে মাথায় সধবার আঁচল আর সিন্দুর নিয়ে যেতে পারবে অফিসে। তার আগে শাঁখা সিন্দুর পরবার জো নেই কমলার।

কিন্তু বিনয় সে কথা বিশ্বাস করল না। স্ত্রীর সিঁথিতে আজই মোটা দাগে সিন্দুর দেখতে না পারলে তার মনে শান্তি নেই স্বস্তি নেই। কমলাও একগুঁয়ে কম নয়। সে বলল, সিন্দুর যদি পরে কাল ভোরে বাসায় এসে পরবে কিন্তু আজ সে সিন্দুর মাখা সিঁথিতে কিছুতেই বেরুবে না।

বিনয়ের আর সহ্য হোলনা। সে বিষাক্ত গলায় বলে উঠল, 'তা বেরুবে কেন। সাদা সিঁথি নকুলের চোখে খুব ভালো লেগেছে যে।'

কমলা বলল, 'সাদা সিঁথি সেদিন তোমার চোখেও তো ভালো লেগেছিল। আজ নকুলদা বলেছে বলেই বুঝি দোষ?'

বিনয় বলল, 'নিশ্চয়ই দোষ।' এগিয়ে গিয়ে বিনয় স্ত্রীর দুই কাঁধ শক্ত করে দুই হাতে চেপে ধরল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ফেলল একেবারে দেয়ালের ওপর; তীব্র করে বলল, 'বল সিঁদুর পরবে কিনা।'

কমলা বলল, 'না কক্ষনো না। যতক্ষণ তুমি আমার কাছে আর নকুলদার কাছে ক্ষমা না চাইছ ততক্ষণ না।'

বিনয়ের আর সহ্য হোল না। স্ত্রীর কাঁধ ছেড়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরল সে। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বার বার ঠুকতে লাগল।

খানিক বাদে বিনয়ের মা ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খুললেন। তখন মূর্ছিতা কমলার সিঁথিতে গাঢ় সিন্দূরের রঙ লেগেছে।

একটু সুস্থ হয়ে সেই যে বাপের বাসায় চলে গিয়েছিল কমলা, তারপর স্বামীর বাড়িতে আর ফিরে যায়নি। দিন কয়েক বাদে ফের টেলিফোন অফিসে যাতায়াত সুরু করেছিল। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটে ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল কমলার।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কমলার বাবা মা ওকে শ্বশুর বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি?'

নকুল বলল, 'করেছিলেন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের একগুঁয়েমি ভাঙতে পারেননি। কমলার ভাইয়েরা, বিশেষ ক'রে বিমল, সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিল।

তারপর রাজনৈতিক অপরাধে কমলার ছোট ভাই জেলে গেল। সংসারের পক্ষে কমলার রোজগার একান্ত দরকার হয়ে পড়ল। কমলার স্বামী অবশ্য এতদিনে অন্য চাকরি সংগ্রহ করে নিয়েছে। কমলার বাবা মা মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার জন্য আগের মত আর পীড়াপীড়ি করলেন না। কমলার নিজেরও তেমন গরজ দেখা গেল না। চাকরি করে, পড়ে, বিমলের সঙ্গে নানা আলোচনা করে। ক্রমে দেখা গেল বিমলেরই তাকে ছাড়া চলে না। কমলা শুধু যে সংসার চালায় তাই নয়, বিমলের ষ্টুডিয়ো সে হাতে গুছিয়ে না দিলে মেজদা ছবি আঁকতে বসতে পারেনা। তার মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। বোনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত বিমল।

অথচ নকুল বলল, কমলা যখন অসুখে পড়ল বিমলই সব চেয়ে আগে দূরে সরে গেল। বিমলের ঔদাসীন্যের জন্যই ওর ভালো করে চিকিৎসা হোলনা। সেবা শুশ্রূষা তো ভালো, শেষদিকে বিমল ভাল করে ওর খোঁজ খবর পর্যন্ত নিত না। বাসায় যে একটি রোগী আছে তা ওর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হত না। কমলার ভার তার অফিসের এক বন্ধুই নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

নকুল বলল, 'যাই বল, তোমাদের মত ক্ষুদে ক্ষুদে চারু

শিল্পীরা এক অদ্ভুত চীজ। জীবনটা তোমাদের কাছে অগোছাল ষ্টুডিও। কেবল অগোছালই নয়, রীতিমত নোংরা। কোন ভদ্রলোক সেখানে ঢুকতে পারেন না। তার চেয়ে আমরা কমার্শিয়াল আর্টিষ্টরা লোক হিসাবে অনেক ভালো।'

হেসে বললাম, 'তা ঠিক। আমি সব সময় উত্তম পুরুষ। কিন্তু উত্তম পুরুষটি কমলার জন্য কি করেছিল শুনি।'

নকুল মাথা নাড়ল। বিমলকে দু' দশ টাকা মাঝে মাঝে ধার দেওয়া ছাড়া নকুল বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। কমলা তাকে করতে দেয়নি। অসুখের খবর পেয়ে ওকে দেখতে গিয়েছিল নকুল, কিন্তু কমলা তাকে বেশীক্ষণ বসতে দেয়নি। 'আমি বেশ আছি নকুলদা, আপনার আর আসবার দরকার নেই এখানে। এক সংসার ভেঙ্গেছে ভাঙুক, কিন্তু আমার জন্য আর এক সংসার ভাঙবে তা আমি চাই না।'

নকুল বিবাহিত। আর তার স্ত্রী সন্দিগ্ধা। সে খবর কমলার জানতে বাকি ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর বিনয়? সে কি স্ত্রীর আর কোন খোঁজ খবর করল না?'

নকুল বলল, 'করেছিল, বার বার এসে যথেষ্ট অনুতাপ জানিয়েছিল। কিন্তু কমলার ভাইয়েরা তাকে আর কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। বলেছে, 'ফের যদি এসে বিরক্ত করে তার মাথা চৌচির হয়ে যাবে।'

কিন্তু মাথা চৌচির না হলেও হৃদয়ে চিড় ধরেছিল বিনয়ের।

কিছুদিন মামলা মোকদ্দমা করবে বলে শাসিয়ে শেষে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে বিনয় আর একটি বিয়ে করল। নতুন বউয়ের সিঁথির সিন্দুর কোনদিন নিষ্প্রভ হয়নি, তা ছাড়া তার পয় ভালো। সে ঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের উন্নতি হয়েছে. সংসারের হাল ফিরেছে।

তারপর মাস পাঁচ ছয় ধরে বীণা গুহ ঠাকুরতারা ফের কলকাতার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। এর মধ্যে একটা মাসিক কাগজের জন্য বীণা আর কমলাকে নিয়ে একবার গল্প লিখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নকুল আমার সর্বনাশ করে গেছে। বিনয়ের কাহিনী বীণার কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে চায়। অথচ দুটো গল্প সম্পূর্ণ আলাদা। বলবার সময় আমরা একটি গল্প বলতে গিয়ে আরো পাঁচটা গল্প বলতে পারি, কিন্তু লিখবার সময় একটি গল্পের মধ্যে একাধিক গল্পের প্রবেশ নিষিদ্ধ। যদি কোন দিক থেকে অন্য কোন গল্পের অঙ্কুর উদ্গত হতে দেখা যায়, নির্মম হাতে তাকে নিড়িয়ে ফেলতে হবে। গল্প হোল শর বৎ। একটি মাত্র তীর, একটি মাত্র লক্ষ্য। আর কোন দিকে তাকাবার তার ফুরসৎ নেই। অর্জুনের মত পাখীর চোখের দিকেই তার চোখ।

কিন্তু জীবন তা নয়। জীবন সহস্র চক্ষু, তার লক্ষ্য

সহস্রাধিক। জীবনের এক গল্পের মধ্যে আরো অনেক গল্পের কেবল অঙ্কুর নয়, শাখা প্রশাখা প্রসারিত। গাছে গাছে তার পরগাছা।

সেদিন ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ইনসিওরেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, অফিস ছুটির আগে আগেই বেরিয়ে পড়ব ভাবলাম, না হলে ট্রাম বাসে আর ওঠা যাবে না। কিন্তু কথায় কথায় উমাপদ বড় দেরী করিয়ে দিল। বলল, 'চল, একসঙ্গেই বের হই।'

বের তো হলাম। কিন্তু ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড থেকে কিছুতেই ট্রামে উঠতে পারি না। ভিড় ঠেলে ঠেলে উমাপদ শেষ পর্যন্ত একটা গাড়িতে গিয়ে উঠল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, এস।'

রাস্তায় তবু দাঁড়াবার জায়গা ছিল। ট্রামের ভিতরে সেটুকু স্থানও নেই। হ্যাঙ্গার নাগালের বাইরে। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বন্ধুর কাঁধ আয়ত্তের মধ্যে পেলাম। একপায়ে খাড়া হয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে চলেছি, কিন্তু মোর ঘুরতে না ঘুরতেই ট্রামখানা ধাক করে থেমে গেল। ব্যাপার কি। ট্রলি কাটা গেছে। সামনে আটদশ খানা ট্রাম ঠায় দাঁড়ান। উমাপদ বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চল।'

বললাম, 'তুমি তো বলছ চল, কিন্তু এই ব্যূহ ভেদ করা কি

সহজ। বরং কিছু কিছু লোক যদি নেমে যায় বসবার জায়গা মিলতেও পারে।'

কিন্তু উমাপদ অসহিষ্ণু। সে বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'দূর, অচল গাড়িতে বসে থেকে কি হবে। তার চেয়ে পথেই বসি গিয়ে চল।'

ও জোর করেই আমাকে টেনে নামাল। দরজার কাছে এসে হঠাৎ চোখে পড়ল বীণা আর মৃন্ময়কে। দুজনে এক বেঞ্চে পাশাপাশি চুপচাপ বসে আছে। বীণার পরনে রঙীন শাড়ী, সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা। সে রেখা সূক্ষ্ম হলেও আমার দৃষ্টি এড়াল না।

ওরা অন্যদিকে তাকিয়েছিল, একবার ভাবলাম ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আর দু' তিনজন সহযাত্রী আমাকে সে সময় দিলেন না, 'আরে মশাই, নামতে হয় নেমে পড়ুন। হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন?'

লজ্জিত হয়ে নেমে পড়লাম। উমাপদকে বললাম, 'বন্ধু না হয়ে তুমি যদি বান্ধবী হতে, তাহলে তুমিও আমাকে আর তাড়াহুড়ো করে টেনে নামাতে না। দিব্যি দু'জনে চুপ করে বসে থাকতাম। ট্রাম না চললেও মৃদুগুঞ্জন চলতে থাকত।

উমাপদ বলল, 'ব্যাপার কি, হঠাৎ তোমার রসসিন্ধু এমন উথলে উঠল কি দেখে।'

যা দেখেছি তা বললাম। কথায় কথায় বীণা আর মৃন্ময়ের কাহিনীও শোনালাম বন্ধুকে। তারপর আপশোষ জানিয়ে

বললাম, 'সবই হোল, কিন্তু খবরটা পর্যন্ত পেলাম না। যেতাম না যেতাম, অন্তত একজন কেউ পত্রদ্বারা ক্রটি স্বীকার করলেও তো পারত।'

উমাপদ বলল, 'ভারি তো কুটুম্বিতা তোমার সঙ্গে। তোমার মত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে হলে কলকাতার অর্ধেক লোককেই ওদের ডেকে আনতে হত। আজকালকার দিনে একজন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ানোর মানে কি জানো। স্রেফ ন' সিকে আড়াই টাকা। তার কমে এক একখানা ডিস হয় না। সেদিন আমার ভাইঝির বিয়েতে খুব টের পেয়েছি।'

আমার কাছ থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে সান্ত্বনার স্বরে উমাপদ ফের বলতে লাগল, 'তাছাড়া তোমারও কোন লাভ ছিল না। ন' সিকের খেতে বটে কিন্তু যাতায়াতে ধর চার গণ্ডা পয়সা। তারপর দু'টাকায় কোন উপহারটা আজকাল পেতে শুনি। ফুল তো আর সব জায়গায় দেওয়া চলে না। ভালোও দেখায় না। অথচ কিছু দিতে গেলেই—এর আগের মাসে তিন তিনটে বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে আমার মাসিক বাজেটে কি যে সে ঘাটতি। পরের বিয়ে দেখতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় আর কি। নিমন্ত্রণ পাওনি বেঁচেছ।'

মনে মনে ভাবলাম কথাটা ঠিক। এসব ফরম্যালিটীর আর কোন মানে হয় না। কেবল শুষ্ক আচার অনুষ্ঠান আছে ভিতরের আনন্দটুকু নেই। আমাদের দিতেও কষ্ট, নিতেও

কষ্ট। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে হলদে কি গোলাপী রঙের এক এক খানা বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পেতে ভালোই লাগে। সেই চিঠির রঙ খানিকক্ষণের জন্য একটি বিবর্ণ দিনকে রঙীন করে দেয়। নিতান্ত আনুষ্ঠানিক একখানা চিঠির মারফৎ স্বজন বন্ধুর কাছে সামান্য স্বীকৃতি পেয়ে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। লৌকিকতার সময় অবশ্য জমাখরচের পাতাটা চোখের সামনে ভাসে। পকেটের কথা মনে পড়লে অলৌকিক আনন্দের উৎস শুকিয়ে আসতে চায়। কিন্তু দাঁত মুখ বুজে কোন কিছু কিনে নিয়ে যেতে পারলে আত্মপ্রসাদের আর অন্ত নেই। বন্ধুর হাসিমুখ দেখি, বন্ধুকে হাসিমুখ দেখাই। সারাদিনের কৃত্রিমতা সেই স্বল্প হাসিতে ঢেকে দিতে চাই। এমনি করে দিন কাটে। পুরোন উৎসব অনুষ্ঠানের অযোগ্যতা আমাদের চোখে পড়েছে—কিন্তু নতুন উৎসব আমরা তৈরী করতে পারিনি, পারিনি নতুন দিনের নতুন কালের যোগ্য হ'তে।

মাস পাঁচছয় পরের কথা। আমাদের যুগবার্তা কাগজে হঠাৎ টেলিফোন অপারেটরদের নিয়ে দিনের পর দিন নানা-কার্টুন বেরুতে শুরু করল। ফোন অফিসের ভিতরকার নানারকম কল্পিত ব্যঙ্গ চিত্র। কাষ্টমার বাইরে থেকে নম্বর চাইছেন অথচ টেলিফোন বালিকা তার সঙ্গিনীর সঙ্গে রসালাপে মত্ত, কোন দিন বা কর্তব্য অবহেলা করে সে প্রসাধন করছে,

কোনদিন বা নভেল পড়ছে, কোনদিন বা প্রেমপত্র লিখছে আর অন্যমনস্কভাবে ভুল নম্বর দিচ্ছে কাষ্টমারকে কিংবা একদম নম্বর দিচ্ছেই না, নম্বর চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছে এনগেজড, তারপর বসছে গিয়ে নিজের কাজে। কখনো বা বলছে 'প্লীজ হোল্ড দি লাইন।' প্রার্থী ফোনের হাতল কানের সঙ্গে লাগিয়ে আছে তো আছেই। কখন ফোন বালিকার সাড়া মিলবে সেই প্রত্যাশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটছে, দিনের পর দিন। তার সুপরিচ্ছন্ন শেভ করা গালে দাড়ি বাড়তে বাড়তে নাভি পর্যন্ত গিয়ে পড়ছে, তবু ফোন বালিকার হৃদয় গলছে না। এমনি সব উপভোগ্য কার্টুন আর তার তলায় ছবিগুলির সরল ব্যাখ্যা। কিংবা সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ মন্তব্য। শুধু তাই নয় সম্পাদকীয় স্তম্ভেও টেলিফোন অপারেটরদের শৈথিল্য নিয়ে নানারকম নিবন্ধ বেরুতে লাগল। বাইরের পাঠকরা গ্রাহকরা থেকে সুরু করে অফিসের সকলেই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করল। শুধু আমি আর নকুল বাদে।

আমি ওকে একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তো জানো অপারেটরদের ভিতরকার অবস্থা। সব দোষের জন্যে ওরাই একমাত্র দায়ী নয়। তবু তুমি নিজ হাতে ও ধরণের কার্টুনগুলি আঁকছ কি করে?'

নকুল মুখ ভার করে বলল, 'সাধে আঁকছি? চাকরি রাখতে হলে কার্টুন আঁকতেই হবে। টেলিফোন অপারেটর তো দূরের কথা, জেনারেল ম্যানেজার যদি বলেন কার্টুনিষ্টকে নিয়ে

কার্টুন এঁকে দাও তাহলেই কি না এঁকে পারব? চাকরি করতে এসে কেবল মাথাই বিকাইনি আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি।'

বললাম; 'কিন্তু কারণটা কি। মশা মারতে কামান দাগা কেন?'

নকুল বলল, 'কামান যাদের আছে তারা মশা মারতেও দাগে পিঁপড়ে মারতেও দাগে। তারা কি তোমার আমার মত? শুনেছি একটা মশা নাকি কামড়ে কামড়ে প্রবীর সেনকে ম্যালেরিয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই এই রাগ।'

বললাম, 'কি রকম কামড়?'

নকুল এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কামড় আবার কি রকম কামড়। মানে রাম কামড়, কাম কামড়।'

জেনারেল ম্যানেজার প্রবীর সেন তখন অবিবাহিত। মশারি নেই, তাই মশকদের উৎপাত সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁর নামে কিংবদন্তী রটত। আসল ব্যাপারটা অন্য রকম। মিঃ সেন একটা জরুরী ফোন নম্বর চেয়ে পাননি। অপারেটরকে কড়া ইংরেজীতে গালাগাল দিয়েছেন। অপারেটরও ছাড়েনি। সেও কড়া ইংরেজী ব্যবহার করেছে। তারপর থেকেই এই সংগ্রামের সূত্রপাত। সংগ্রামই বলতে হবে। কারণ অপারেটর পক্ষও নেহাৎ চুপ ক'রে রইল না। কিংবা চুপ করেই রইল। দু'তিন দিন কার্টুন বেরুবার পরেই তারা চূড়ান্ত অসহযোগিতা করতে লাগল। আমরা

তাদের ডেকে কিছুতেই সাড়া পাইনে, তারা বধিরা, আমরা অধীর।

এমনি যখন অবস্থা আমাদের ব্যাঙ্ক একস্‌চেঞ্জে বীণা গুহঠাকুরতাও তো কাজ করে। তাকে ডেকে ব্যাপারটা মিটমাট করা যায় কিনা। অনেক কষ্টে একজন ফোন অপারেটরের সাড়া পেলাম।

'নাম্বার প্লীজ।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'নম্বর চাইনে, বীণা গুহঠাকুরতা নামে একটি মেয়ে কাজ করতেন, তিনি কি আছেন এখনো?' জবাব এল, 'আছেন। তবে তিনি আর এখন গুহঠাকুরতা নেই, তাঁর পদবী বদল হয়েছে।' তারপর একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। অপরিচিতা অপারেটরটি একটু বাদে ফের বললেন, 'বীণাদির দুপুরের সিফটে ডিউটি ছিল, সে চলে গেছে। আপনার কি বলবার আছে বলুন। আমি নোট রেখে যাব।' আমি আমার বক্তব্য জানিয়ে বললাম, 'বীণাদেবী যেন আমার সঙ্গে কালই আমাদের অফিসের পর এসে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে।' অপরিচিতা আমার নাম ধাম, পূর্ণ পরিচয় নিয়ে তবে ফোন ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বীণা এসে উপস্থিত। তার সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে সোনার পাতের মোড়া লোহা বাঁধান। আর এক হাতে ছোট একটি ঘড়ি। তার চেহারা আর বেশ-

বাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি বদলায়নি। এসেই আক্রমণ করল, 'এসব কি শুরু করেছেন আপনারা? একি অভদ্র নোংরামি? একি জঘন্য ইতরতা?'

আমি বললাম, 'গলাটা একটু নামান আর শব্দগুলিকে একটু মোলায়েম করুন বীণাদেবী, কারণ অফিসটা আমাদের মানে আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের। তিনি এখনো তাঁর কেবিনে রয়েছেন।'

বীণা বলল, 'তাহলে তো ভালোই, আমি তাঁর কাছেই এসেছি। তাঁর ঘর আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাঁর সঙ্গেই আগে কথা বলব।'

'আমরা' মানে শুধু গৌরবে বহুবচন নয়। বীণা একা আসেনি, ফোন অফিসের আরো গুটি তিনেক মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তারা সবাই আমার টেবিলের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। তাদের আসন যোগাতে গিয়ে আমার জন দুই সহকর্মী স্বেচ্ছায় চেয়ারচ্যুত হলেন।

বীণা ইংরেজীতে টাইপ করা দু'তিন সীট কাগজ বার করল। যুগবার্তায় প্রকাশিত কার্টুন আর মন্তব্যের বিরুদ্ধে তারা তাদের বক্তব্য লিখে এনেছে।

বীণা বলল, 'আপনি নিমন্ত্রণ না করলেও আমি আসতুম। ষ্টেটমেণ্টটা লিখে টাইপ করাতে দিন দুই দেরী হয়ে গেল। কই কোথায় আপনাদের জেনারেল ম্যানেজার, আমাদের নিয়ে চলুন তাঁর কাছে, আলাপ করি।'

আমি জেনারেল ম্যানেজারকে গিয়ে বীণার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি প্রথমে দেখা করতে কিছুতেই রাজী হন না। বললেন, 'বেশ তো ওঁরা ওঁদের written statement দিয়ে যান, আমরা ছাপব।'

কিন্তু বীণা নাছোড়বান্দা, সে তাদের বিবৃতি শুধু কলমের মুখে দিয়ে তৃপ্ত নয়, নিজের মুখেও দিতে চায়।

শেষ পর্যন্ত মিঃ সেনকে দর্শন দানে রাজী হতে হোল, বীণা সঙ্গিনীদের নিয়ে ঢুকল তাঁর রুমে, আমিও রইলাম সঙ্গে। মিঃ সেন আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা কল্যাণবাবু আপনি আসুন। ওঁদের কি বলবার আছে আমি শুনি।'

আমি বেরিয়ে এলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে মিঃ সেনকে বীণারা তাদের বক্তব্য শোনাল। মাঝে মাঝে তার চড়া গলা আমাদের হলঘর থেকেও শুনতে পেলাম। যাওয়ার সময় বীণা আমার সঙ্গে ফের এসে দেখা ক'রে বলল, 'মিঃ সেন আমাদের statement ছাপতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু ওটা নাকি বাংলায় অনুবাদ করে দিতে হবে। দেখুন তো এত খেটে গ্রামার আর ডিকসনারি দেখে দেখে ইংরেজী লিখলুম, এখন বলছেন বাংলায় ক'রে দিন। আপনারা তো বাংলা-নবীশ রয়েছেন। বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিতে পারবেন না?'

বললাম, 'বেশ রেখে যান।'

বীণা মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু ভরসা হয় না। আপনারা শত্রুপক্ষ। অনুবাদের অছিলায় হয়ত অনেক বাদসাদ

দেবেন। তারচেয়ে আমরাই ফের বাংলায় লিখে দেব। আপনি গিয়ে নিয়ে আনবেন। কাল সকালে যাবেন। চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। আপনার তো একটা নিমন্ত্রণ পাওনাও আছে।'

বীণা একটু হাসল।

বললাম, 'সে কথা মনে আছে আপনার?'

বীণা বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। তাহলে কাল সকালেই আসুন। অবশ্যই আসবেন। আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে বসে থাকব। খবরদার সে চা যেন জুড়িয়ে না যায়।' রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর জানিয়ে বীণা বিদায় নিল।

আমার সহকর্মী রাখালবাবু বললেন, 'মশাই, আপনার সঙ্গে তো খুবই রসের সম্পর্ক দেখছি। কিন্তু ভদ্রমহিলার শুধু হাতেই লাল ঝাণ্ডা নয় মাথায়ও তাই। একটু বুঝে শুনে সম্পর্ক পাতাবেন।'

হেসে বললাম, 'আপনার সাবধানবাণী মনে থাকবে।'

নম্বরটা মাণিকতলা মেইন রোডের, কিন্তু বাড়িটা গলির মধ্যে। পুরোণ একটা দোতলা বাড়ীর সামনে এসে কড়া নাড়তেই বীণা দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াল, 'এই যে আসুন। আমি ভাবলুম এলেনই না বুঝি। অনেক বেলা করলেন।'

বললাম, 'একটু দেরি হয়ে গেল। মৃন্ময় বাবু কোথায়?'

বীণা আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুখ নিচু ক'রে বলল, 'ভিতরে আসুন।'

ভাড়াটে বাড়ির সারি সারি ঘর। গোলমাল চেঁচামেচি চলছে কলের কাছে। সঙ্কীর্ণ বারান্দায় কয়েকটা উনানে আঁচ উঠেছে। এক পাশ দিয়ে পথ ক'রে বীণার পিছনে পিছনে পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বীণা মৃদুস্বরে আমন্ত্রণ জানাল, 'আসুন।'

একতলায় মাঝারি আকারের একখানা ঘর। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বেশি নেই। কিন্তু একটি মাদুরের সামনে কয়েকটি তুলি রঙের বাটি আর ইজেলের ওপর অসমাপ্ত একটি ছবির আভাস দেখে আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা কি। মৃন্ময় বাবুর আবার ছবি আঁকবার সখও আছে নাকি? তা তো জানতাম না।'

বীণা আমার মুখের দিকে তাকাল' 'আপনি ভুল করেছেন। ছবি মৃন্ময় বাবু আঁকেন না। এ ষ্টুডিয়ো বিমল বাবুর।'

হঠাৎ বিসদৃশ একটা চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঝলসে উঠল। একটু হেসে বললাম, 'আর আপনি বুঝি তাঁর মডেল, না প্রেরণার উৎস?'

আমার হাসির মধ্যে যে শ্লেষ ছিল তা একেবারে প্রচ্ছন্ন রইল না। বীণার মুখও কঠিন দেখাল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন। মডেল হবার মত চেহারা আমার নেই। কাউকে

প্রেরণা যোগাব এমন যোগ্যতাই বা কই। শুধু ঘর দোর গুছিয়ে দিতেই জানি।'

'এতদূর এসেছেন ঘর দোর গুছাতে?'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ তাও আসতে হোল। আমি ওঁর স্ত্রী।'

স্ত্রী!

আমি একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না আমার ভুল হয়েছিল।'

বীণা একটু হাসল, 'তাতে কি হয়েছে, সাহিত্যিকদের অমন দু'একটা ব্যাকরণ ভুল হয়ই।'

বললাম, 'সেদিন আপনাকে আর মৃন্ময় বাবুকে ট্রামে পাশাপাশি যেতে দেখে—'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ, তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন তাই পাশে বসতে অনুরোধ করলাম। তিনি অনেক ইতস্তত ক'রে ব'সে পড়লেন। আপনাকে অনুরোধ করলে আপনিও তো বসতেন। কিন্তু তার জন্য কেউ যদি কোন রকম ভুল করতো, আপনি কি তাকে আস্ত রাখতেন নাকি?' বীণা মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, 'একটু বসুন। তরকারিটা নামিয়ে রেখে আসছি।'

বীণার চাপল্যে একটু বিস্মিত হলাম। বিয়ের পর মেয়ে-দের প্রগলভতা এমন এক আধটু বাড়ে।

এক পাশে দেয়াল ঘেঁষে বিছানা গুটানো। ইজেলের সামনে একটি চায়ের কাপ। কাপের মধ্যে সিগারেটের ছাই।

একটু বাদে ফের ঘরে এল বীণা। তাকের উপর থেকে সবুজ রঙের সেলুলয়েডের কাপ ছুটো পেড়ে নিয়ে গেল।

যে কাপটা ছাইদানী হয়েছিল বিমলের সেটাও সরিয়ে নিল এক ফাঁকে।

বললাম, 'ওসব আবার কেন?'

খানিক বাদে চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল বীণা, আর একটি প্লেটে ছুটি সিঙ্গাড়া আর ছুটি সন্দেশ।

বললাম, 'শুধু চা-ই তো যথেষ্ট ছিল। আবার ওসব আনতে গেলেন কেন।'

বীণা বলল, 'নিন্। মিষ্টি তো আপনার পাওনাই আছে।'

বললাম, 'সে কি এই মিষ্টি নাকি?'

বীণা মৃদু হেসে বলল, 'যার যেটুকু সাধ্য।'

বললাম, 'কিংবা যার যেটুকু প্রাপ্য। সে কথাও বলা যায়।'

অল্প দামী বাজে কাঠের একটা চেয়ারে আমি বসেছিলাম। আর একটা চৌকো টুল মাত্র ঘরে ছিল। সেটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'বসুন।' বীণা টুলটাকে আরও একটু এগিয়ে এনে বলল, 'ষ্টেটমেণ্টটা সব এখনো লিখে উঠতে পারিনি। কাল রাত্রে শরীরটা ভারি খারাপ লাগতে লাগল।'

'তাতে কি আজ বিকেলে পাঠিয়ে দিলেও কালকের কাগজে বেরুবে।'

ষ্টেটমেণ্ট প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেলে ছুজনেই একটুকাল চুপ করে রইলাম।

খানিক বাদে আমি বললাম, 'আপনাদের তো সিভিল ম্যারেজ। রেজেষ্ট্রী করে—'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ। শুধু কালি কলমের ব্যাপার। আর কোন অনুষ্ঠানই হয়নি। কজন সাক্ষী ছাড়া কোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকেই বলা যায়নি। বলবার মত অবস্থা ছিল না।'

বললাম, 'ভেবেছিলাম আমিই শুধু হতভাগ্য। প্রেমজ বিবাহের এই এক দোষ। ভোজটা বাদ যায়।'

বীণা একটু হাসল, 'প্রেমজ বিবাহ কি করে বুঝলেন?'

বললাম, 'এ কি আর বুঝতে বাকি থাকে?'

বীণা একটু চুপ করে থেকে মুখ নীচু ক'রে বলল. 'আপনার দোষ নেই। সবাই তাই বুঝেছে। এমন কি সেও। ভেবেছিলাম সেদিন ট্রামে সব তাকে বলব। কিন্তু কিছুই বলা হয়নি। সেও আর কোন কথা শুনতে চায়নি। আপনি যদি শুনতে চান তো, বলি। কিন্তু আপনাকে বললে কি আর কারো জানতে বাকি থাকবে? আপনার পেটে তো কথা থাকে না।'

মৃদু হেসে অভিযোগটুকু স্বীকার করে নিলাম। কারণ এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম আমার কাছ থেকে বিশেষ একজন কেউ কথাগুলি জানুক সেইটাই বীণার উদ্দেশ্য।

সেদিন অতদিন পরে টেলিফোন অফিসের দোরের সামনে মৃন্ময়কে দেখে কেবল বিস্ময় নয়, অদ্ভুত এক ধরণের বিদ্বেষেও মন ভরে উঠেছিল বীণার। খানিকক্ষণ আগে ক্লার্ক ইনচার্জের সঙ্গে সামান্য কথান্তর হয়ে গেছে। ইনচার্জ চার্জ করেছেন, কেন এমন অভিযোগ এল তার নামে। বীণা জবাব দিয়েছিল 'কেন এল কেন আসে, তা আপনার অজানা থাকবার কথা নয়। কারণ দুদিন আগেও আপনি একজন অপারেটর ছিলেন। হ্যাণ্ডস সর্ট, কল বেশি, আর বোর্ডের যা অবস্থা—'

কাজ সেরে অফিস থেকে বেরোতেই মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ডালহৌসী স্কোয়ারের ভিতরে গিয়ে মৃন্ময় তার পাশাপাশি বসে স্বীকার করল যে সেই অভিযোগ করেছে বীণার নামে। পাছে তার জন্যে তার চাকরির ক্ষতি হয় তাই ছুটে এসেছে বীণার কাছে। বীণা তাকে ভরসা দিয়ে বলল না এই সামান্য নালিশে তার চাকরির কোন মারাত্মক ক্ষতি হবে না। ও সব তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। মৃন্ময় কি জন্যে এসেছে তা বীণার বুঝতে বাকি রইল না। শুধু করুণা শুধু অনুকম্পা। কিন্তু কারো কাছ থেকে করুণা ভিক্ষার আর প্রয়োজন নেই বীণার। সেসব বালিকাপনার দিন সে পার হয়ে এসেছে। অবশ্য সহজে পার হতে পারেনি। তার জন্যে সময় লেগেছে দুঃখে নৈরাশ্যে দেহের শিরা উপশিরাগুলি অসাড় হয়ে এসেছে। অফিসে ডিউটি দিতে দিতে কতদিন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে বীণা। নাইট ডিউটির শেষে ঘণ্টা দুই রাত বিছানায় শুয়ে

বীণার ঘুম আসেনি অনিদ্রায়, দুই চোখের ভিতর জ্বলেছে, বুকের ভিতরটা পুড়ে গেছে।

কিন্তু সব কিছুরই শেষ আছে। সব পারাপারেরই পার আছে। বিরহ বিচ্ছেদ দুঃখ কষ্টেরও। মৃন্ময়ের সঙ্গে যখন দেখা বীণা তখন সেই পারে এসে পৌঁচেছে। আগের স্মৃতি তাকে তেমন আর পীড়া দিল না। হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে। যে তার মৃন্ময় নিজের হাতে ছিঁড়ে দিয়েছিল, কালের হাতে তাতে গিঁট পড়েছে।

করুণা করতে এসেছে মৃন্ময়, সহানুভূতি জানাতে এসেছে! করুণা ছাড়া মৃন্ময় তাকে আর কিই বা দিতে পারে। সে ভালো চাকরি পেয়েছে, বিদূষী রূপসী মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, বীণাকে দেওয়ার মত তার আর কি আছে। বীণাই বা তার কাছ থেকে কি আর নিতে পারে। না, আদান প্রদানের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে। সব সম্পর্কের জন্ম মৃত্যু আছে। প্রেমের সম্পর্কেরও।

তবু যখন বীণা সেদিন বাসায় এসে মঞ্জুর কাছে শুনল মৃন্ময় এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। ভাবল মৃন্ময় ফের আবার কেন এল। অত কাজের পরেও ওর কি এ বাসায় আসতে কোন সঙ্কোচ হোল না! না কি পুরুষদের কিছুতেই কিছু হয় না? ওরা সব পারে। কিন্তু মৃন্ময়ের আসবার উদ্দেশ্যটা কি? উপযুক্ত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে সে বিয়ে করেছে এইটা বার বার বীণাকে মনে করিয়ে দেওয়াটাই

কি ওর অভিপ্রায়। একটা কেন দশটা বিয়ে করুক না মৃন্ময়, বীণার তাতে কিছুমাত্র হিংসা হবে না।

কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে বেশি ভাববার বীণার ইচ্ছাও ছিল না, সময়ও ছিল না। এসোসিয়েশনের ইলেকসন আসছে। নিজেদের উপদলটি যাতে একজিকিউটিভে সবগুলি সীট পায় তার জন্যে বীণার খাটুনির বিরাম ছিল না। তাছাড়া—

কমলার অসুখ আবার বেড়েছিল। বীণা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চাকরি রক্ষা, পারিবারিক দায়িত্ব সেরে ওকে ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য খাওয়ানো সস্তায় কোথায় এক্সরে করা যায় তার জন্য তদ্বির ছুটোছুটি। বীণার অন্য কিছু ভাববার সময় কই। তবু ওকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক দেখে কমলা এক একদিন টিপ্পনী কাটত, 'মুখপুড়ী আমার কাছে লুকোচ্ছিস, কিন্তু তুই তাকে এখনও ভুলতে পারিস নি।'

বীণা বলত, 'কক্ষণো না। আমি কি তোর মত।'

'ওর জীবনেরও একটু ইতিহাস ছিল।' বীণা তার নিজের কাহিনী থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল।

বললাম, 'সে ইতিহাস আমি শুনেছি।' কার কাছ থেকে শুনেছি সে কথাও ওকে জানালাম।

বীণা বলল, 'আমি একদিন আপনাকে বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই বলিনি। যে ইতিহাসে কমলার নিজের বিশ্বাস ছিল না, আপনি হয়ত সেটাকেই বড় ক'রে তুলতেন। কিন্তু শেষের দিকে দাম্পত্য বিচ্ছেদের দুঃখটা কমলার জীবনের

বড় দুঃখ ছিল না, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাজে কর্মে চিন্তায় পড়াশুনোয় কমলা জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সময় পেল না। তার আগেই ওর শরীর ভেঙে পড়ল।'

বীণা একটু থেমে ফের বলল, 'কমলা তার অতীতকে স্বীকার করতে চায়নি।

বীণাও অস্বীকার করতেই চায়। দুই বন্ধুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয়েছিল। কেউ ভুলতে পারেনি একথা ঠিক। দুজন পুরুষের দুষ্কৃতির কথা তারা মনে রেখেছে।

কমলার সঙ্গেই বন্ধুত্ব ছিল বীণার। কিন্তু বিমলকে সে দেখতে পারত না। এমন দায়িত্বহীন আত্মসর্বস্ব পুরুষ বীণা আর দেখেনি। সাহিত্য আর শিল্পকলার ওপর বীণার ঝোঁক ছেলেবেলা থেকেই কম। ইদানীং উৎসাহটা আরও নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। যদি বা একটু আধটু ছিল বিমলের চাল চলনে সেটুকুও নষ্ট হয়ে গেল। বন্ধুকৃত্যের জন্য কমলাকে দেখা শোনার ভার, সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার ভার বীণা যখন নিজের ঘাড়ে নিল বিমল প্রথমে এক আধ বার ভদ্রতা করল, কৃতজ্ঞতা জানাল, কিন্তু তারপর বীণার সঙ্গে প্রায় কোন যোগাযোগই রাখল না। কমলা ভুগছে, পরিবারের ভালো ক'রে অন্ন সংস্থান নেই কিন্তু বিমল তার ছবির সমস্যার কথা ভাবছে, পনের দিন ধরে হয়ত একখানা ছবি আঁকারই চেষ্টা করছে। পছন্দ মত না আঁকতে পেরে কখনো তার মেজাজ

খারাপ হচ্ছে কখনো বা সব ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের এক কোণে নিঃশব্দে অলস ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে।

বীণা বলত, 'আচ্ছা কমলা, বিমলদা কোন কাজকর্ম করেন না কেন।'

কমলা জবাব দিত, 'করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছবি আঁকা ছাড়া অন্য কোন কাজ ওঁর সয় না।'

বীণা বলত, 'কিন্তু ছবি আঁকবার কাজও যে ওঁর খুব সয় তা তো মনে হয় না। কই কারো কাছে ওঁর নামও শুনি না, ওঁর ছবিও কোথাও দেখতে পাই না।'

কমলা তার মেজদার নিন্দায় চটে গিয়ে বলত, 'আজ পাসনে কাল পাবি। জিনিসটা অত সহজ নয়। একি টেলিফোনের অপারেটরি যে তিন মাস ট্রেণিং নিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়।'

বীণা আর কিছু বলত না। মেজদা সম্বন্ধে যে কমলার খুব দুর্বলতা আছে তা সে টের পেয়েছিল। কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারেনি। পুরুষ মাত্রের ওপর কমলার বিদ্বেষের অন্ত নেই, তার মেজদার মত অমন একজন কাপুরুষের ওপর কমলার কেন অত মমতা। কেন সে তাকে অমন ক'রে প্রশ্রয় দেয়। নিজের দাদা বলে? কিন্তু বীণারও তো বাবা আছে। দোষ ত্রুটী দেখলে তাঁকেও তো সে ছেড়ে দেয় না। মুখের ওপর স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয়। বীণার ধারণা কেবল মৃন্ময় আর বিনয়ই নয়, বিমলেরও শাস্তি হওয়া উচিত, কারণ

সাংসারিক দায়িত্বে তারও তো ত্রুটি হয়েছে। এর সংশোধন হওয়া দরকার। কিন্তু কমলা তার দাদার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি বিফলতা ব্যর্থতা সযত্নে বন্ধুর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। অদ্ভুত স্নেহ ওর দাদার ওপর। শ্রদ্ধা নয় স্নেহ। কমলা যেন বিমলের ছোট বোন নয়, দিদি।

কমলার মত তার বাবা মাও প্রথম প্রথম ছেলের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করতেন। সস্নেহে বলতেন, বিমল ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। খেয়ালী, বাতিকগ্রস্ত। ওর সেই 'সূর্যাস্ত' আর 'বৃদ্ধ' নামে ছবিটা কি দেখেনি বীণা। অনেকে সে ছবি দু'খানার প্রশংসা করেছেন। বিমলের মত অত অল্প বয়সে এমন দরদ দিয়ে বার্ধক্যের চিত্র আর কেউ নাকি আঁকতে পারেনি। একথা মহেশবাবুর অনেক বন্ধুই নাকি বলেছেন। বীণা অবশ্য সে ছবির মধ্যে এমন কোন তাৎপর্য খুঁজে পায়নি। বিমলের হাতের আঁকা বুড়ো মানুষটিকে বুড়ো বলে যদি বা বোঝা যায় মানুষ বলে চিনতে পারা কঠিন।

কিন্তু চাকরি বাকরিতে যখন বিমল কোন সুবিধা করতে পারল না, ছবিও বাজারে তেমন বিক্রি হোল না, এদিকে কমলা পড়ল অসুখে, তার বাবা মার মনোভাবও বদলে গেল। গোড়ার দিকে বীণার সামনে তাঁরা আর ছেলের নিন্দা মন্দ করতেন না। পরে তাও করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে মহেশবাবু ছেলের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করলেন, স্ত্রীকে গঞ্জনা দিতে ছাড়লেন না। মার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই নাকি বিমল

অমন অকর্মণ্য হয়েছে। একথা শুনে একদিন বিমলের মা ষ্টুডিওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'তুই যদি ওই গর্ত থেকে না বেরোস, আমি নিজে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।'

বীণা তখন কমলার ঘরে বসে কথা বলছিল। নিজের কথা থামিয়ে কান খাড়া ক'রে সব শুনতে লাগল। আজকাল বীণার সামনেই এসব ঝগড়া ঝাটি চলে, সংসারের অভাব অনটন নিয়ে আলোচনা হয়।

বিমলের গলা শোনা গেল, 'কেন হয়েছে কি।'

বিমলের মা চীৎকার ক'রে বললেন, 'কি হয়েছে তুই দেখতে পাসনে? সংসার কি ক'রে চলে সে খেয়াল আছে?'

'ও। সেই কথা? দাঁড়াও এই ছবিটা শেষ হ'লেই—।' কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল সে ছবি বিমল শেষ করতে পারেনি। রাগ করে তার ওপর কালি ঢেলে নিজেই নষ্ট করেছে।

বীণা থার্মোমিটারে কমলার তাপ নিচ্ছিল, উদ্‌ভ্রান্তের মত বিমল এসে ঘরে ঢুকল।

কমলা বলল, 'কি হোল দাদা।'

বিমল অত্যন্ত নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে বলল, 'কিছুই হোল না রে।'

কমলা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'হবে, হবে। যাও কোথাও বাইরে টাইরে থেকে একটু ঘুরে এসো।'

বিমল মাথা নাড়ল, 'না কমলা, আমি মন স্থির করে ফেলেছি। জীবনে আর তুলি ধরব না। এ পথ আমার নয়। পছন্দ মত রঙ পাচ্ছি না। পৃথিবীতে কোন রঙ নেই। সব কালো, সব অন্ধকার। আমি তোর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম ফের যদি এ পথ কোন দিন মাড়াই—।'

বীণা দেখতে পেল কমলার চোখ ছল ছল করছে। বিমলকে কড়া এক ধমক দিয়ে বলল, 'পথ মাড়ান আর না মাড়ান, এ ঘর আর মাড়াবেন না। এখানে আর ঢুকবেন না আপনি। জানেন ওর অসুখ বেড়েছে—।'

বিমল বিস্মিত হয়ে বলল, 'বেড়েছে! কেন এই দু'দিন আগেও তো বেশ ভাল ছিলি কমলা। নিশ্চয়ই কোন অনিয়ম টনিয়ম করেছিস। আর কি যে এক অসুখ ঢুকিয়েছিস তুই।'

বিমলের বিরক্তির যেন আর শেষ নেই।

শুষ্ক ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল কমলার, 'তা ঠিকই দাদা। অসুখটার ঢোকা উচিত ছিল না।'

বিমল বলল, 'বীণা, তুমি আর একবার ডাক্তার সেনের কাছে যেয়ো তো। আবার কেন হঠাৎ বাড়ল। আর একবার এক্সরে করিয়ে দেখলে কেমন হয়।'

বীণা বলল, 'বেশ তো দেখুন না।'

মজা মন্দ নয়। ডাক্তারের কাছে যেতে বীণাকেই হুকুম করছে বিমল। যেন দায়িত্বটা বীণারই। ইচ্ছা হোল খুব

কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু কমলা দুঃখ পাবে ভেবেই বীণা সেদিন চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু আর একদিন ঠিক চুপ ক'রে থাকতে পারল না।

ওষুধ পথ্যে ইনজেকশনে কমলা ফের একটু সুস্থ হয়ে উঠেছে, বীণা অফিসের ছুটির পর তার কাছে বসে বসে এসোসিয়েশনের ইলেকসনের গল্প করছে বিমল এসে ঘরে ঢুকল। ভারি খুশী। কি যেন অপার্থিব সম্পদ এইমাত্র কেউ তার হাতে দিয়ে গেছে এমনি ভাব।

কমলা বলল, 'কি দাদা, ছবি হোল? কোন্‌টা যেন সুরু করেছিলে। শীত, না?'

বিমল প্রসন্ন স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে কমলা। জামরুল গাছ থেকে কি রকম পাতা ঝরছে দেখবি একবার? আচ্ছা থাক, আর একটু রিটাচ করতে হবে। কাল সকালেই দেখিস। বীণা কাল সকালে পার ত একবার এসো। সামান্য একটু বাকী আছে।'

বীণা একটু হাসল, 'এখনও বাকী? এক শীতের ছবি আঁকতে তো আপনার বসন্ত, গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষণ সুরু হয়েছে। তবু আপনার শীত শেষ হোল না?'

বিমল বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বর্ষা, তাই তো।' টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। মাঝে মাঝে বিদ্যুত চমকাচ্ছে।

বিমল বলল, 'কমলা যাবি?' বহুদিন বর্ষা দেখিনি।

বর্ষা কেন, কিছুই দেখিনি। ছিল শুধু শীত। চল আজ একটু ঘুরে আসি; যেটুকু বাকী আছে ফিরে এসে সারব।'

কমলা মুখ টিপে হাসল, 'খুব ভাল লাগছে, না মেজদা। তবে যে বলেছিলে ছবি আঁকা ছাড়বে।'

বিমল লজ্জা গোপন করে বলল, 'হয়েছে হয়েছে, যাবি তো ওঠ্।'

বীণা এবার ধমক দিল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই বৃষ্টি বাদলের মধ্যে, ও রোগা মানুষ কোথায় যাবে? আপনার ইচ্ছা থাকে আপনি যান।'

তাড়া খেয়ে বিমল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে বীণাও উঠল, যাওয়ার সময় বন্ধুকে বারবার সাবধান ক'রে দিল, 'খবরদার ওসব খেয়াল টেয়ালে পাছে কান দিস। রোগ কিন্তু আর্ট আর্টিষ্টের ধার ধারে না। এক-মাত্র মেডিক্যাল সায়ান্সকে মানে।'

কমলা বলল, 'আরে না না। তুই কি ক্ষেপেছিস। মেজদা বললেই হোল? আমি আজ বিছানা ছেড়ে উঠলে তো?'

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার পর এসে বীণা দেখল কমলা সত্যিই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। ফের জ্বর এসেছে। কাসিও বেড়েছে।

বীণা যোগমায়াকে ডেকে বলল, 'মাসীমা ফের আবার এমন হোল যে।'

মাসীমা জবাব দিলেন, 'হবে না ? কাল দুই ভাই বোনে মিলে নটার শোতে সিনেমায় গিয়েছিল যে। বৃষ্টি ভিজে রাত বারটায় ফিরেছে।'

'আপনি যেতে দিলেন কেন ?'

যোগমায়া বললেন, 'কপাল আমার। এতদিন ধ'রে কি দেখছ তুমি। আমার কোন কথাটা ছেলেমেয়েরা শোনে।'

কমলার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে বীণা সেদিন চলে এসেছিল। আর দু'তিন দিনের মধ্যে কোন খোঁজ নেয়নি। মরুক কমলা।

কমলা অবশ্য সে যাত্রা মরেনি। দিন কয়েক বাদে ফের একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওদের সংসারের অবস্থা আর ভালো হোল না। এদিকে বীণাই বা কত টানবে। কত চেয়ে চিন্তে আনবে পরের কাছ থেকে।

একজন টেলিফোন অপারেটরের কাকার ছিল বইয়ের দোকান। তিনি ছেলেদের বই ছাপতেন। স্ত্রী-ভূমিকাহীন ডিটেকটিভ উপন্যাস। তার ওপরে আর ভিতরে ছবি থাকে। বীণা অনেক বলে কয়ে বিমলের জন্য কাজ সংগ্রহ করে আনল।

শ' দুই টাকা তারা দেবে।

বিমল ভ্রূ কুঁচকালো, 'এত অল্প টাকায় এই কাজ।'

রাগ ক'রে বীণা কোন কথা বলল না।

কমলা এবার বলল, 'না করলে চলবে কি করে দাদা ? বীণার আর সাধ্য নেই।'

বিমল বলল, 'আচ্ছা।'

অবস্থা শুনে কিছু টাকা পাবলিশার বিরাজবাবু অগ্রিম দিয়েছিলেন। বিমল কাজ সুরু করল। কিন্তু তার অসন্তুষ্টির আর সীমা নেই। একাজ মানুষে পারে।

কমলা রাগ ক'রে বলল, 'বেশ, না পার ছেড়ে দাও। না খেয়ে মরুক সবাই। বাবা আর কত করবেন।'

শেষ দিকটায় কমলার মেজাজও খিটখিটে হয়ে উঠেছিল।

'আচ্ছা।' বলে গম্ভীরমুখে ঘরে চলে গিয়েছিল বিমল।

কিন্তু সেই আগের অবস্থা। ঘর থেকে আর বেরুতে চায় না। এদিকে বিরাজবাবু তাগিদের পর তাগিদ দিচ্ছেন। তাঁর বইয়ের মরশুম সুরু হয়ে গেছে। তিনি আর দেরী করতে পারেন না। এক সপ্তাহের জায়গায় প্রায় একমাস সময় নিয়েছে বিমল। টাকাটা মেরে দেওয়ার মতলব নাকি তার।

বীণার নিজেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রাগ ক'রে বিমলের ঘরে গিয়ে ঢুকল, দেখল সাদা কাগজের সামনে বিমল তুলি হাতে চুপ চাপ বসে রয়েছে।

বীণা বিরক্ত হয়ে বলল, 'অত ভাবছেন কি বলুন তো। ব্যাপারটা তো আগাগোড়া কমার্শিয়াল। যা হয় দু'টানে সব শেষ ক'রে দিন।'

বিমল জবাব দিয়েছিল, 'তা দেওয়া যায় না বীণা। আঁকতে আঁকতে আমার মনে হচ্ছিল ফাইন আর্ট আর কমার্শিয়াল আর্ট বলে আলাদা কোন জিনিস নেই। সব

ছবির হয় গোড়ায় না হয় শেষে কমার্শিয়াল। হয় যশ না হয় অর্থ। কিন্তু মাঝখানে সে সব কিছুই নেই, আছে শুধু রঙ আর তুলি। আমার দুঃখ আর আমার আনন্দ। মাঝখানটুকু আমার নিজের, মাঝখানটুকু ছবির নিজের।'

বীণা বলেছিল, 'বই আর টাকাটা আপনার নিজের নয়, তার মালিক বিরাজবাবু। সে কথা মনে রাখবেন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যোগমায়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল বীণার।

'কি হোল, বলে কয়ে কাজে বসাতে পারলে?'

বীণা বলল, 'চেষ্টা তো করছি মাসীমা। এখন বিরাজ-বাবুর কাছে আমার মুখ থাকলে হয়।'

মুখ থাকেনি। দু' তিনখানা ছবি বিমল শেষ পর্যন্ত তাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বিরাজবাবু দেখে মুখ বাঁকিয়ে ছিলেন। 'একি মাথামুণ্ডু হয়েছে? ছেলেদের বইয়ে এসব চলে? মিছামিছি আমার টাকা আর সময় নষ্ট।'

বীণা ম্লানমুখে বলল, 'আপনার পঞ্চাশটা টাকা— ।'

বিরাজবাবু হেসে বলেছিলেন, 'সেজন্য তুমি ভেব না মা? টাকা আমি উশুল করতে জানি। এ তিনখানা ছবি আমাকে চালাতে হবে। এ বইয়ে না হোক, অন্য বইয়ে ঢুকিয়ে দেবো। আরো পাঁচখানা ছবির সঙ্গে চলে যাবে। কি আর করা যায় বল, যা অবস্থা শুনলাম ভদ্রলোকের— ।'

সেদিন সন্ধ্যার সময় কমলাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে

তার অসুখ সম্বন্ধে বিমলের সঙ্গে আলাপ করছিল বীণা। বিমলকে বাইরে ডেকে এনে বলল, 'ওকে বাঁচাবার জন্যে শেষ চেষ্টা করতে হবে। আমি হাসপাতালগুলিতে ফের ঘোরাঘুরি ক'রে দেখি কোন সুবিধে করা যায় কিনা। আর আপনি চেষ্টা করুন টাকার। যেভাবে পারেন শ তিনচার টাকার জোগাড় করুন।'

বিমল বলল, 'আমি এত টাকা কোথায় পাব।'

বীণা বলল, 'আশ্চর্য, আপনি কোথায় টাকা পাবেন তাকি আমি বলে দেব? আপনি পুরুষ ছেলে না? ওকে সারিয়ে তুলবার দায়িত্ব কি আমার না আপনার? আমি আমার সাধ্যমত দিয়েছি, আমাদের যা আর্থিক অবস্থা তাতে আর এক পয়সা দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

বিমল পরম অকৃতজ্ঞের ভাষায় বলল, 'সম্ভব না হয়, দিয়ো না। তোমার কাছে চায় কে।'

বীণা আরও রূঢ় ভাষায় জবাব দিতে যাচ্ছিল হঠাৎ পিছন থেকে আর একজনের গলা শুনতে পেল, 'এই যে তুমি এখানে। আমি তোমাদের অফিসে ফোন করেছি, বাড়িতে গেছি, এসোসিয়েশন অফিসে খোঁজ নিয়েছি, তারপর এখানে এসে দেখা পেলাম। গোড়াতে এখানে চলে এলেই হোত।'

বিমলদের বাড়ি পর্যন্ত মৃন্ময় ধাওয়া করেছে দেখে বীণা শুধু বিস্মিত নয়, স্তম্ভিতও হোল, বলল, 'হ্যাঁ, তা হোত।

কিন্তু তুমি এখানে কেন। আমাকে কিসের এত তোমার দরকার যে সারা সহর খুঁজে বেড়াচ্ছ ?'

মৃন্ময় বলল, 'দরকার না থাকলে কি আর খুঁজি ? এঁর সঙ্গে তোমার কথা শেষ হয়ে গেছে, তা'হলে এসো।'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ, আমার কথা শেষ হয়েছে। এসো এবার তোমাদের আলাপ করিয়ে দেই। মৃন্ময় নন্দী, ফুড ডিপার্টমেণ্ট-এ কাজ করেন। আর ইনি বিমল মুখার্জী, আর্টিষ্ট।'

দুজনে নিঃশব্দে নমস্কার বিনিময় করল। মৃন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, ওর আর্টের নমুনা আমি দেখেছি। তোমার পড়ার টেবিলের কাছে পেনসিল স্কেচে, ওর আঁকা তোমার একটা কার্টুন দেখে এসেছি সেদিন।'

বিমল প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'আমি কোনদিন কার্টুন আঁকিনে।'

মৃন্ময় অদ্ভুত একটু হাসল, 'আঁকেন না। কিন্তু আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তা কার্টুনই হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা আপনার দোষ নেই, বীণার যা চেহারা তাতে কার্টুন ছাড়া অন্য কোন রকম ছবি হওয়া বোধ হয় সম্ভব না।'

বিমলের সামনে এই অহেতুক অপমানে বীণার বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠল, 'আমার চেহারা ভালো হোক, মন্দ হোক, আমার কেউ কার্টুনই আঁকুক আর পোরট্রেটই আঁকুক তাতে তোমার তো কিছু এসে যায় না, তুমি তোমার নিজের কাজে যাও।'

মৃন্ময় বলল, 'তাতো যাবই। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যে দরকারটুকু আছে তা সেরে তবে যাব। আমি যে বাস ট্রামে এত পয়সা নষ্ট করলাম, এত সময় নষ্ট করলাম তাতো মিছামিছি নয়।'

বীণা বিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে যা বলে গেলাম তা যেন মনে থাকে।'

বিমল নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে ভিতরে চলে গেল।

বীণা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে বলল, 'কি দরকার তোমার শুনি?'

মৃন্ময় বলল, 'তার আগে বল এই আর্টিষ্টটিকে পাকড়ালে কবে থেকে? আমি চলে যাওয়ার পর কদিন অপেক্ষা করেছিলে?'

বীণা বলল, 'একদিনও না. এক মিনিটও না। কেন অপেক্ষা করব? তুমি লাথি মেরে চলে যাবে আর আমি যুগযুগান্তর ধ'রে তোমার পদযুগলের ধ্যান করব তাই কি তুমি ভেবেছ নাকি?'

মৃন্ময় বলল, 'তা কেন ভাবতে যাব। করযুগল পদযুগলের অভাব আছে নাকি তোমাদের? ফোন অফিস ভরেই তো ওই কাণ্ড। তা কি আমার জানা নেই?'

বীণা বলল, 'আমাকে এসব কথা বলাই কি তোমার একান্ত দরকার? না আর কোন কাজ আছে?'

মৃন্ময় বলল, 'আছে বৈকি। আমি সেই চিঠিগুলি ফেরৎ চাই।'

বীণা হেসে বলল, 'আশ্চর্য, ব্লাক মেলের ভয় মেয়েরাই করে। তোমার বেলায় দেখি সব উল্টো। ভয় নেই, তোমার সুন্দরী বউয়ের কাছে আমি সেই চিঠির তাড়া নিয়ে কোনদিন হাজির হব না। তুমি নিশ্চিন্তে বিয়ে করে ঘর সংসার করতে পার। তাছাড়া তুমি কি ভেবেছ সে সব চিঠির একটা টুকরোও আমার কাছে আছে? অনেক দিন আগেই তা আগুনে দিয়েছি। তোমার কাছে যদি দু' একখানা থেকে থাকে তুমি যত্ন করে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দিতে পার। হয়ত একদিন কাজে লাগবে।'

মৃন্ময় বলল, 'সত্যি বলছ একখানা চিঠিও তোমার কাছে নেই?'

বীণা বলল, 'না।'

মৃন্ময় বলল, 'আচ্ছা আছে কি নেই দুদিন বাদেই তা জানতে পারব। আমার পুরোণ চিঠি খুঁজে বার করবার লোক তোমাদের বাড়ীতেই আমার আছে।'

বীণা বলল, 'কে মঞ্জু?'

মৃন্ময় বলল, 'মঞ্জু হবে কেন, তোমার বাবা। তাঁকে এমন মন্ত্র কানে দিয়ে এসেছি যে তিনি আমার জন্যে সব করবেন।'

বীণা বিস্মিত হয়ে বলল, 'বাবার সঙ্গেও ফের দেখা সাক্ষাৎ করেছ নাকি? কি তোমার অমোঘ মন্ত্র?'

মৃন্ময় বলল, 'বাড়ি গিয়েই শুনতে পারবে।'

বীণা আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

মৃন্ময় অন্য সুরে ডাকতে লাগল, 'সত্যিই চললে নাকি? শোন শোন, শুনে যাও, আরো কথা আছে।'

বীণা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার আর কোন কথা নেই।'

মৃন্ময় তবু পিছনে পিছনে আসছিল বীণা ওব হাত এড়াবার জন্যে আর একজন বান্ধবীর বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

অমিতা বলল. 'কিরে এত ছুটতে ছুটতে হন্ত দন্ত হয়ে এলি যে।'

বীণা বলব, 'গুণ্ডা পিছু নিয়েছিল।'

অমিতা হেসে বলল, 'আশ্চর্য, তুইও গুণ্ডাকে ভয় করিস।'

বীণা বলল, 'সময় সময় করি বইকি।'

বাসায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে বীণার বাবা গিরীনবাবু বললেন, 'রোজ রোজ কোথায় এত রাত করিস, মৃন্ময় অনেকক্ষণ এসে বসেছিল।'

তার সঙ্গে যে মৃন্ময়ের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে সে কথা প্রকাশ না করে বীণা বলল, 'সে আবার এখানে আসেই বা কেন, বসে থাকেই বা কি জন্যে?'

গিরীনবাবু বললেন, 'বাঃ মানুষের বাড়ীতে মানুষ আসে না? তাছাড়া যখন এক দেশ দেশী লোক আমরা।'

বীণা বলল, 'কিন্তু সে যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করে গেছে—'

গিরীনবাবু বললেন, 'সেজন্যে আমিও তো ওকে মারতে

উঠেছিলাম, বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিলাম। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া বিবাদ হয়, কত দেওয়ানী ফৌজদারী, মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায়, তাই বলে কি চিরজীবন ধ'রে তাই মানুষ মনে করে বসে থাকে নাকি? তাছাড়া অপরাধ ক'রে মানুষ যদি ক্ষমা চায় তাহলে আর থাকে কি। মৃন্ময় প্রায় আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে গেছে তা জানিস?'

মা আর মঞ্জুর কাছে বীণা আরো অনেক কথা জানতে পারল। মৃন্ময় শুধু ক্ষমাই চায়নি, আরো কিছু দিতে চেয়েছে। গভর্ণমেণ্ট রেশন ষ্টোরে সে গিরীনবাবুকে একটি ভালো চাকরী জুটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কালই রাইটার্স বিল্ডিংএ গিয়ে গিরীনবাবু তার সঙ্গে দেখা করবেন। এই একটি সঞ্জীবনী মন্ত্রে শুধু বীণার বাবা নয়, মা, মঞ্জুর ছোট ভাইবোন-গুলি পর্যন্ত যেন নতুন জীবন পেয়ে বেঁচে উঠেছে। হাসি ফুটেছে সকলের মুখে। শুধু বীণাই রইল মুখ গম্ভীর ক'রে। বাবাকে বলল, 'ওর মত লোকের কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে আপনার লজ্জা করে না?'

গিরীনবাবু বললেন, 'লজ্জা আবার কিসের। ও তো আর আমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না। কাজটাও ওর বাড়ীর নয়, সরকারের। মাস ভর খাটব তার বদলে মাইনে পাব। ও শুধু যোগাযোগ করিয়ে দেবে। এর মধ্যে অনুগ্রহ নেওয়া নেওয়ির কি আছে।'

তারপর আরো অনেক কথা বলতে লাগলেন গিরীনবাবু।

পরের কাছ থেকে অনুগ্রহ না নিয়েই বা তার উপায় কি, বীণা তো যা রোজগার করে তা অর্ধেকই পথে পথে বিলিয়ে দিয়ে আসে। তার তো দান ধ্যানই শেষ হয় না। বাবা মা ভাই বোনের মুখের দিকে কি সে তাকায়। নিজের পথ গিরীনবাবুকে নিজে দেখতে হবে বইকি। নাবালক ছেলেমেয়েগুলিকে এ দুর্দিনে বাঁচিয়ে তো রাখতে হবে। উল্টাডিঙ্গির আড়তের আয়রোজগার কমে গেছে। কর্তাদের যা ভাবভঙ্গী তাতে সে চাকরি যেতেই বা কতক্ষণ। আখেরের কথা ভাবতে হবে না গিরীনবাবুকে? এতগুলি জীবনের দায়িত্ব তাঁর ওপর। এতো আর ছেলেখেলা নয়, এতো আর মেয়েলী মান অভিমানের পালা নয়।

বীণা বলল, 'আপনার যদি কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকে মৃন্ময় নন্দীর সঙ্গে আপনি কখনো চাকরির উমেদারীতে যাবেন না।'

কিন্তু মেয়ের এই নিষেধ গিরীনবাবু মোটেই শুনলেন না। তিনি রোজ মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন। আর আশ্চর্য, দিন দশেকের মধ্যে সত্যিই জুটিয়ে ফেললেন চাকরি। তাও যে সে চাকরি নয়। দক্ষিণ কলিকাতার একটি সরকারী রেশন ষ্টোরের ম্যানেজারী। করিৎকর্মা লোক বটে মৃন্ময়। ও যা মনে করে তাই করতে পারে। আত্ম-প্রসাদে আত্ম-প্রত্যয়ে মন ভরে উঠল গিরীনবাবুর। এখন আর মেয়ের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে না। নিজের রোজগারেই

পারবেন সংসার চালাতে। কারণ কাজটা ভালো, একটু বুঝে শুনে চারদিকে চোখ রেখে চলতে পারলে মাইনের উপর কিছু উপরিও পকেটে আসবে। মেয়ের চালচলন কথাবার্তায় প্রসন্ন না হলেও তাকে তেমন চটালেন না গিরীনবাবু। কারণ এটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে কোন কারণেই হোক বীণার খাতিরেই তাঁকে খাতির করছে মৃন্ময়।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে মঞ্জু একদিন ফিসফিস ক'রে বলল, 'দিদি, মৃন্ময়দার বোধ হয় মন ফিরে গেছে। দিন কয়েক বাদেই বীণা গুহঠাকুরতার বদলে তুমি বীণা নন্দী লিখতে পারবে। বাবাকে চাকরি দেওয়া আমাদের সঙ্গে ফের মেলা-মেশা আসলে তারই ফন্দী।'

ছোট বোনকে ধমক দিল বীণা—'চুপ কর। ঘুমো। বড় পাকা পাকা কথা শিখেছিস।'

ফন্দী মানে তো ফাঁদ। সে ফাঁদে বীণা আর ধরা দেবে না। মৃন্ময় বুঝুক বাবাকে চাকরি দিলেই মেয়েকে অপমান করবার অধিকার জন্মায় না। অত সস্তা মেয়ে নয় বীণা। তার রূপ গুণ না থাকতে পারে, কিন্তু সে একটা কুকুর নয় যে যখন ইচ্ছা লোকে তাকে দূর দূর করে লাথি মারবে আবার যখন ইচ্ছা তু তু ক'রে কাছে ডাকবে। তাছাড়া মৃন্ময়ের ভাষা ভঙ্গি, বাপকে চাকরির ঘুষ দেওয়া, সবই বীণার কাছে খারাপ লাগতে লাগল। পরম বিতৃষ্ণার বিষয় বলে মনে হোল। তাছাড়া সুস্মিতার সঙ্গে মৃন্ময়ের সম্বন্ধের কথাবার্তা, চড়া পণ

যৌতুক নিয়ে দর কষাকষি, মৃন্ময়ের বাবা আর স্নিগ্ধতার বাবার মধ্যে তখনো চলছে। সুস্মিতা আর তার বাবাকে নিয়ে খেলাবার ভার মৃন্ময় তার বাবার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, গিরীন-বাবু আর বীণাকে নিয়ে কৌতুক করছে সে নিজে। কিন্তু বীণার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে আর কারো ক্রীড়াকৌতুকের সামগ্রী হয়ে থাকতে রাজী নয়। সংসারে তার আরো অনেক কাজ আছে। চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে।

এসোসিয়েশনের কাজে কদিন ধ'রে খুব ব্যস্ত ছিল বীণা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সঙ্ঘটীকে হাতে নিতে চাইছে। জেনারেল সেক্রেটারীর ইচ্ছা নিরপেক্ষ থাকবার। বীণা আর তার কয়েকজন সহযোগিনীর অভিমত, এ নিরপেক্ষতার কোন মানে নেই। নির্দিষ্ট নীতি আর আদর্শ বেছে নেওয়ার সময় এসেছে। এই নিয়ে ছুটির পরে এসোসিয়েশন অফিসে তর্ক-বিতর্ক আলাপ আলোচনা চলছিল। নিজেদের দল যাতে জেতে তার জন্য বীণা আর তার বন্ধুদের চেষ্টার বিরাম ছিল না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় খবর এল কমলার অবস্থা খুব খারাপ।

বীণা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। মনে ভারি অনুতাপ হোল, এসোসিয়েশনের কাজে ব্যস্ত থাকায় কদিন ধরে কমলার আর কোন খোঁজখবর নিতে পারেনি। অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে।

বাস থেকে নেমে পা টিপে টিপে বাড়ির কাছে গিয়ে

পৌঁছল বীণা। আর সমস্ত শব্দ ডুবিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দই যেন সব চেয়ে তখন বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আর একটু এগুতে কমলার মার তীব্র কান্নায় সে শব্দও তলিয়ে গেল। 'তুই কোথায় গেলি মা, আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় গেলি।'

ষ্টিথোস্কোপ গলায় পাড়ার ডাক্তার নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। পড়শীদের ভিড় ঠেলে বীণা যখন ঘরে গিয়ে ঢুকল, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সোনালী পাডওয়ালা সাদা মিহি খদ্দরের চাদরখানা কমলার ভারি পছন্দ ছিল। সেই চাদরেই ওর সর্বাঙ্গ ঢাকা। কেবল মুখখানা বাইরে আছে। পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সুগঠিত চিবুক, পরম ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মুখখানা শেষবারের মত ভারি সুন্দর মনে হোল বীণার। পরমুহূর্তে সে মুখ ঝাপসা হয়ে গেল।

মহেশবাবু অবিচল। এর চেয়ে প্রত্যাশিত আর কি ছিল। শেষকৃত্যের সাহায্যে প্রতিবেশীরা কয়েকজন এগিয়ে এল। খাটে তুলবার আগে কমলার মা স্বামীকে আর বীণাকে ফাঁকে ডেকে নিয়ে কান্না চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওতো সধবা। ওকে আলতা আর সিঁদুর পরিয়ে দেব?'

মহেশবাবু মাথা নাড়লেন, 'না। ও যেভাবে ছিল সেই ভাবেই যাক।'

অথচ সামান্য কারণে স্বামী-ত্যাগিনী এই মেয়েটির ওপর তাঁর বিরাগের অন্ত ছিল না। ওর মিথ্যা কৌমার্যের বেশ তাঁর সংস্কারকে চিরদিন পীড়া দিয়েছে।

এর পর খোঁজ পড়ল বিমলের। বিমল কোথায়? কে যেন বলল সে তার ষ্টুডিয়োতেই আছে। একটু আগে বেরিয়েছিল, আবার গিয়ে ঢুকেছে। তাকে কি কেউ ডেকে আনবে?

মহেশবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, তাকে আর ডেকে দরকার নেই। আমরাই পারব।'

বীণা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন, 'তুমি বাসায় তোমার মাসীমার কাছে থাক মা। তাকেও তো একজনের আগলানো দরকার! বিমলকে দিয়ে তো কিছুই—' বলতে বলতে থেমে গেলেন মহেশবাবু।

কিন্তু একটা হিংস্র ক্রোধে বীণার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কেন? কেন ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না? এই রকম প্রশ্রয় দিয়েই কমলা তার মেজদার সর্বনাশ করে গেছে, নিজেকেও বলি দিয়েছে। এর কি শেষ হবে না? বীণার ইচ্ছা হোল বিমলের ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে ওকে ঘর থেকে বের করে আনে, 'স্বার্থপর অপদার্থ পুরুষ, যাও, এখনো যাও, যে বোন তোমার জন্যে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করেছে, তার জন্যে যেটুকু পার এখনও কর গিয়ে।'

আজ কোন্ ছবি আঁকতে বসেছে বিমল দেখবার ভারি ইচ্ছা হোল বীণার। কমলার পরম প্রিয় বন্ধু কমলার নিষ্ঠুর আত্মসর্বস্ব দাদার কাছ থেকে সে ছবি আজ ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দেবে।

দোর ঠেলে বীণা ভিতরে ঢুকল। অন্ধকার ঘর। স্যুইচ

টিপে আলো জ্বালল। না, বিমল আজ ছবি আঁকতে বসে নি। তার সমস্ত অসমাপ্ত ছবি ঘরময় টুকরো টুকরো করে ছড়ানো। ইজেলের উপর মুখ চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে বিমল। সমস্ত ইজেলটা আজও চক চক করছে। রঙে নয়, জলের ওপর বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি পড়েছে। আস্তে আস্তে স্যুইচটা ফের অফ করে দিল বীণা। তারপর এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রেখে বলল, 'বিমলদা।' গলাটা ভাল করে ফুটল না। চোখের জল টপ টপ শব্দে বিমলের পিঠের উপর পড়তে লাগল। দুই শোকার্ত অপরাধী আজ কাছাকাছি বসেছে।

কতক্ষণ কাটল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ যোগমায়ার আর্তস্বরে দুজনেই চমকে উঠল, 'বিমল, ও বিমল, তোরা কোথায়!'

বলতে বলতে যোগমায়া ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ও তোমরা এখানে।'

যোগমায়া আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

বীণাও অপ্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নানারকম ভাবে সান্ত্বনা দিল মাসীমাকে, শ্মশান থেকে মহেশবাবুরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর প্রায় ভোর সময় ফিরে এল বাড়িতে।

গিরীনবাবু সদর দরজা খুলে দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'সারা রাত কোথায় ছিলি। কাল তো তোর নাইট ডিউটি ছিল না।'

বীণা বলল, 'না, কাল কমলা মারা গেল। ওদের

বাড়িতেই ছিলাম এতক্ষণ। এইমাত্র মহেশবাবুরা ফিরলেন শ্মশান থেকে।'

গিরীনবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আহা মরেই গেল মেয়েটা। ও কাল রোগে যাকে ধরে তার ছাড়া পাওয়া শক্ত। চোখের ওপর কত দেখলাম। কিন্তু যে যাবার সে তো যাবেই। তুই সারারাত ওই রোগীর বাড়িতে থাকতে গেলি কেন। যা ভালো ক'রে সাবান টাবান দিয়ে চান ক'রে ফেল। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুমো। কি চেহারাই হয়েছে।'

বাপের একান্ত স্বার্থপর রূপই বীণা এতদিন ধরে দেখে এসেছে। কিন্তু আজকের এই দরদ, মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্যে এই উদ্বেগটুকু ভারি ভালো লাগল। ভিতরে এসে সাবান গামছা নিয়ে বাথরুমে ঢুকছে। গিরীনবাবু বললেন, 'মৃন্ময় কাল অনেকক্ষণ এসে বসেছিল। কমলাদের বাসায়ও গিয়েছিল। কান্নাকাটি শুনে বোধ হয় আর ভিতরে ঢোকেনি।'

সঙ্গে সঙ্গে বীণার মন বিরূপ হয়ে উঠল। বাবার সমস্ত দরদ তাহলে এইজন্যেই। সমস্ত স্নেহ ভালোবাসা মৃন্ময়ের জন্যেই। ঋণ শোধের বস্তু, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় ছাড়া বাবা তাকে আর কিছু ভাবতে পারেন না। মৃন্ময়ের সেই রূঢ় ব্যবহার অভদ্র ভাষায় বিকৃত মুখভঙ্গি বীণার মনে পড়ল। আর তার পাশাপাশি চোখের সামনে ভেসে উঠল বিমলের করুণ কোমল সেই শোকস্তব্ধ মুখ। মনে পড়ল দুজনের সেই

নিঃশব্দ যৌথ শোক প্রকাশ। সেই এক রাত্রে বিমল তার স্বার্থপরতা, ভীরুতা অযোগ্যতার মরুভূমি পার হয়ে যেন একটি শ্যামল কোমল শস্যভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বীণা আর সেদিন অফিসে গেল না। সারাদিন ঘুমুল; মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে লাগল কমলাকে, তার পাশে বিমলকেও যে দু'একবার না দেখল তা নয়, কিন্তু বোনের শোকে অশ্রুসিক্ত বিমল, একান্ত আত্মকেন্দ্রিক আর্টিষ্ট বিমল নয়।

বিকেলে উঠে বীণা চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে, মঞ্জু এসে খবর দিল, 'বিমলদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কি চেহারাই না হয়েছে বিমলদার। গাল ভরা দাড়ি, চুলগুলি উস্কোখুস্কো, মুখের দিকে যেন আর চাওয়া যায় না।'

বিমল এর আগে তাদের বাড়িতে আর আসেনি, কমলার অসুখের খোঁজ খবর নিয়ে বরং মহেশবাবু এসেছেন। কিন্তু বিমল নড়েনি তার ষ্টুডিও থেকে। আজ শোকাতুর হয়ে সে তাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শুনে বীণাও তাদের তেতালা থেকে নেমে এল। এসে কোমল স্বরে বলল, 'কি ব্যাপার, আসুন, ভিতরে আসুন।'

বিমল বলল, 'না ভিতরে আর যাব না। কিন্তু ভালো লাগছে না, তাই বেরিয়ে এলাম, তুমিই বরং একটু বাইরে চল। কথা আছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বীণা ওর পিছনে পিছনে চলল। দুজনে

এসে ঢুকল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসল। এই বেঞ্চেই কতদিন মৃন্ময়ের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। কিন্তু সে কথা আজ আর বীণার মনে পড়ল না, মানুষের মন অনেকটা পার্কের এই বেঞ্চের মতই, একজন উঠে গেলে সে আর একজনের জন্যে জায়গা ক'রে দেয়।

সন্ধ্যা উৎরে গেল। কিন্তু বিমল আর বীণার কথা যেন আর ফুরোয় না। সে কথা কমলারই কথা। কিন্তু বলছে বীণা শুনছে বিমল, আবার কখনো বলছে বিমল শুনছে বীণা। দুজনের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি একই সুরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

খানিকক্ষণ বাদে বিমল যাওয়ার জন্যে উঠে পড়ল। বীণা তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে গেল বাড়ি অবধি। সদর দরজা খোলাই ছিল। বিমল কিন্তু ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না, বলল, 'বাড়ি যেন শূন্য হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে না যে একা একা আর ভিতরে ঢুকি। তুমি কি আসবে? এসে বসবে একটু আমার ষ্টুডিওতে?'

এর আগে ষ্টুডিওর নাম শুনলে বীণা চটে উঠত। কিন্তু আজ চটল না। পিছনে পিছনে গেল ওর ঘরে। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। নিজের হাতে গুছিয়ে দিল।

বিমল বলল, 'অসুখের মধ্যেও কমলাই এসব করত। একটু ভালো থাকলেই এসে বসত আমার পাশে। ও না বসলে আমার ছবি আসত না, অবসর পেলেই তুমি কিন্তু এসো। তাহলে বোধ হয় ফের আঁকতে পারব।'

কমলার শূন্য আসনে কি বীণাকে বসাতে চায় বিমল? কিন্তু তাই কি হয়? একজন কি আর একজনের জায়গা নিতে পারে?

বীণার মনে পড়ল কমলা একদিন বলেছিল, 'আমি মরে গেলে আমার মেজদাকে তুই দেখিস ভাই। আমাদের কারো একজনের আশ্রয় ছাড়া মেজদা থাকতে পারবে না।'

বীণা জবাব দিয়েছিল, 'তুই মরবি কেন। কিন্তু তোর মেজদাকে কারো দেখার দরকার হবে না। ভারি স্বার্থ-পর মানুষ। নিজেই নিজের পক্ষে যথেষ্ট।' কমলা হেসে বলেছিল, 'ভুল করলি। স্বার্থপররা নিজেদের ওপর ভর দিয়ে চলতে জানে না। সব সময়েই তাদের আরো দু'একজনের দরকার হয়। এই অর্থে তারা পরার্থপর।'

কমলার কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তা তার মৃত্যুর একদিনের মধ্যে বীণা টের পেল।

তারপর যত দিন যেতে লাগল বীণার ওপর বিমলের নির্ভরতা তত যেন বেড়ে চলল। বীণা একবার করে তার ষ্টুডিওতে না গেলে বিমলের ষ্টুডিও গুছানো হয় না। বীণার সঙ্গে নতুন ছবির স্কীম আর টেকনিক নিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ না করলে ইজেলের সামনে মন স্থির করে বসতে পারে না বিমল। দেখতে দেখতে বীণা ওর কাছে প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। বয়স্ক পুরুষের এই নাবালকত্ব সব সময় যে ভালো লাগে, সব সময় যে সহ্য হয়, তা নয়। দু'এক সময় রূঢ় কথাও বলে বীণা,

দু'একদিন দেখা সাক্ষাৎ বন্ধও রাখে। কিন্তু বীণা যেদিন যায় না সেদিন বিমল আসে, বাড়িতে দেখা না পেলে অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করে। ভিতরে ঢুকতে পারে না। বাইরে রাস্তার অন্য পারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

বীণা একদিন বলল, 'ছি ছি ছি, আপনি এভাবে কেন আসেন। লোকে দেখলে বলবে কি। তাছাড়া আমি তো কেবল একাই নয়। সিফটে সিফটে কত মেয়ে ঢোকে কত মেয়ে বেরোয়। ওরা নিশ্চয়ই ভাবে আপনি ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন।'

বিমল বলল, 'দেখিইতো। আমি ওদের মধ্যে কমলাকে দেখতে পাই বীণা। তাই একবার করে রোজ আসি এখানে।'

বীণার মধ্যেও বিমল কমলাকে দেখতে পাচ্ছিল কিনা বলা যায় না,—হয়ত প্রথম প্রথম তাই পেত—কিন্তু বাড়ির সবাই ভিন্ন রকম দেখল। বীণাদের বাড়ির, বিমলদের বাড়ির, পাড়ার জানা-অজানা সবগুলি বাড়ির সবগুলি চোখে তাদের দু'জনের একই সম্পর্ক ধরা পড়ল। পাড়ার বখাটে ছেলেদের বিদ্রূপ শোনা গেল, উভয় পক্ষের অভিভাবকদের শাসন অনুশাসন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল।

গিরীনবাবু বললেন, 'তোমার দান-ধ্যান-বদান্যতার কারণ আমি তখনই টের পেয়েছিলাম। এবার আরো ভালো করে বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না। এ

সব বদমাসী আমি সহ্য করব না। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারছিনে, ছি ছি ছি।'

বিমলদের বাড়িতে গেলে আজকাল বিমলের বাবা মাও খুসি হন না। যে বাড়িতে তার আদরের সীমা ছিল না, সেখানে এই অনাদর অপমান বীণাব বুকে বিঁধল। কিন্তু ঘা খেয়ে, বাঁধা পেয়ে সে পিছিয়ে গেল না। তার জেদ বেড়েই চলল। বলুক ওরা যা খুসি, করুক ওরা যা খুসি সে বিমলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা বন্ধ করবে না। আর তখন পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হোত না তাদের মধ্যে। এমন কি ওসব কথা মনেই উঠত না। কেন যেন ঠিক প্রণয়ীর স্থানে দয়িতের স্থানে বিমলকে বসাতে পারত না বীণা। কমলার দাদা এই ছিল বিমলের একমাত্র পরিচয়। শ্রদ্ধা ভালোবাসার পাত্র নয়, স্নেহ আর অনুকম্পার পাত্র।

কিন্তু বিমলের মা-ই সেদিন বললেন, 'তুমি আমাদের অনেক সময় অনেক রকম উপকার করেছ। তাছাড়া তোমার মত বন্ধু কমলার আর ছিল না। তাই এসব কথা তোমাকে বলতে আমার বাধে। কিন্তু না বলেও যে এখন আর পারিনে বীণা। নিন্দায় কেলেঙ্কারিতে পাড়া ছেয়ে গেছে। যদি আমাদের বামুনের ঘরের মেয়ে হতে কোন কথা ছিল না। বিয়ে দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু তাও তো পারা যাবে না। জাত যে আলাদা। বড় হয়েছ। ভালোমন্দ বোঝবার বয়স

হয়েছে তোমাদের। তুমি আর ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না, দেখা সাক্ষাৎ কোরো না, আমি বিমলকেও না করে দিচ্ছি।'

বীণা বলল, 'হ্যাঁ তাই দিন। আমাকে দোষারোপ করার চেয়ে নিজের ছেলেকে নিষেধ করুন।'

বলে বীণা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল ওদের বাড়ি থেকে।

কিন্তু বেরিয়ে এসেও নিষ্কৃতি নেই। মৃন্ময় তার পথ আটকে ধরেছে। সে বলল, 'কি মূর্তিমতী শিল্পকলা, আর্টিষ্টের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হোল?'

বীণা বলল, 'হোক কি না হোক সে খোঁজে তোমার কি দরকার। তুমি কেন আমার পিছু নিয়েছ। তুমি কি চাও আমার কাছে।'

এর আগেও মৃন্ময় তার সঙ্গে বার বার দেখা করতে চেষ্টা করেছে। বাড়িতে কিংবা অফিস থেকে ফেরার পথে দু'একবার দেখা হয়েছে। প্রথম প্রথম দু'এক মিনিট খুব ভালোভাবেই আলাপ করতে চেষ্টা করেছে। চা খেতে ডেকেছে কিংবা হয়ত প্রস্তাব করেছে এক সঙ্গে আগের মত সিনেমায় যাওয়ার। কিন্তু বীণা কিছুতেই রাজী হয়নি। কখনো কখনো বা সত্যিই কাজের অজুহাতে বীণা তার সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তার মনই চায়নি ওসব আমোদ-প্রমোদ। ওসব খেলা তো যথেষ্টই হয়েছে আর কেন। আর বীণার প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই ভিন্ন মূর্তি বেরিয়ে পড়েছে। সে লোক মানেনি, জন মানেনি, পথ মানেনি, পার্ক মানেনি, রূঢ় অকথ্য ভাষায় বীণাকে

অপমান করেছে। বিমলের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চালিয়েছে।

আজও তাই সুরু করল। মৃন্ময় বলল, 'কি অফুরন্ত মূর্তিমতী অমৃতের ভাণ্ডার তুমি যে হাঁড়িতে যত হাত ডুবাও তত অমৃত উঠে আসবে! পরের ওই এঁটো হাঁড়িতে মুখ দিতে আমার বয়ে গেছে। আমার উচ্ছিষ্ট নিয়ে একটা নেড়ী কুকুর কেন এক ডজন নেড়ী কুকুর কামড়া কামড়ি করুক, কুকুরের ছোয়ায় আমি নিজে আর ফের হাত দেব নাকি?'

শ্রীনাথ দাস লেন আর ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় এ-ধরনের আলাপ চালাতে লাগল মৃন্ময়। জন দুই তিন পথচারী একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে কান পেতে শুনতে লাগল এই অপূর্ব প্রণয়ালাপ।

বীণার আর সহ্য হোল না, বলল, 'তুমি ভেবেছ আমার বাবাকে চাকরি দিয়ে তুমি আমাদের বাড়িশুদ্ধু লোকের মাথা কিনেছ। তুমি যদি ফের রাস্তার মধ্যে আমাকে অপমান করবে, আমি রাস্তার লোক ডেকে তোমাকে মার খাওয়াব।'

একথা শুনে জনকয়েক লোক সত্যি সত্যিই তাদের ঘিরে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে কি হয়েছে।' মৃন্ময়কে লক্ষ্য করে বলল, 'হ্যাঁ, মশাই পেয়েছেন কি আপনি।' ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে শেখেন নি? দেব নাকি শিখিয়ে?'

মৃন্ময় আর দাঁড়াল না, যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আচ্ছা এর শোধ আমিও একদিন নেব। মনে

রেখ সব চাবিকাঠি আমার হাতে। রাস্তার এক ডজন বাবার চেয়ে ঘরের একটি বাবা বেশি দরকারী।'

জন দুই লোক তেড়ে যাচ্ছিল, মৃন্ময় একটা আধা চলন্ত ট্রামে উঠে আত্মরক্ষা করল।

তারপর অনেক কষ্টে পথচারীদের কৌতূহল আর সহানুভূতির হাত এড়িয়ে বাসায় ফিরে এল বীণা। এসে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। জলের ধারা নামল দুই চোখে। কিন্তু তবু রেহাই নেই। খানিক বাদেই খবর গেল বিমল এসেছে নিচে। তার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। বীণা মঞ্জুকে দিয়ে বলে পাঠাল, 'বল গে যা, দিদির শরীর ভালো নেই। সে পারবে না দেখা করতে।'

কিন্তু বিমল নাছোরবান্দা। সে বেশি সময় নেবে না। একটি মাত্র কথা বলেই যাবে, সে কথাটি খুব জরুরী।

বীণা গায়ে আঁচলটা টেনে দিয়ে পরম আক্রোশে নিচে নেমে এল। আজ সে সব কথা শেষ করে দিয়ে আসবে, চুকিয়ে দিয়ে আসবে সব সম্পর্ক। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গলির এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বীণা বলল, 'কি কথা আপনার।'

বিমল শান্ত গম্ভীরস্বরে বলল, 'আজ বিকেলে মা তোমাকে যে সব কথা বলেছেন তা আমি শুনেছি। আমাকেও ঠিক এই একই ভাষায় শাসন করেছেন।'

শাসন! বীণার হাসি পেল। কেমন যেমন একটু

অভিমান আর অভিযোগের সুর আছে বিমলের গলায়।

বীণা বলল, 'তাহলে আপনি ফের আবার এলেন কোন সাহসে, মাতৃভক্ত ছেলের মার আঁচলের তলাতেই তো বসে থাকা উচিত ছিল।' যান, বাড়ি যান। আর আসবেন না। জানেন তো পাড়ার লোকজন যা তা বলতে সুরু করেছে।'

বিমল বলল, 'হ্যাঁ, ওদের মুখ বন্ধ করবার জন্যেই আমি এসেছি বীণা, একমাত্র বিয়েতেই তা সম্ভব হবে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

বলে আস্তে আস্তে বিমল ওর হাতখানা চেপে ধরল।

বীণা একটুখানি স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'শুধু কি পাড়ার লোকের মুখ বন্ধ করবার জন্যেই—'

বিমল একটু হাসল, 'শুধু কি সেই জন্যেই লোকে বিয়ে করে! বিয়ে আমরা নিজেদের জন্যেই করব। তাই করতাম। শুধু দশজনে হৈ চৈ করে তারিখটাকে এগিয়ে দিল।'

বীণা বলল, 'কিন্তু কি ক'রে জানলেন আমি এতে রাজী হব, আমি আপনাকে ভালবাসি। আমি যদি আপনাকে ভালোবাসতে না পারি—'

বিমল বলল, 'আমি যখন পেরেছি তুমিও পারবে। তা আমি জানি বীণা। শুধু তোমারই তা জানতে বাকি আছে, হয়ত আরো দেরিও আছে। সে দেরি আমার সইবে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া একটি দিনও আমার আর সহ্য হবে না।'

একটু দূরে গলির অন্ধকারে লোক জনের সাড়া পাওয়া গেল। বীণা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এল ভিতরে।

দু'পক্ষ থেকেই প্রবল বাধা এসেছিল। তার মধ্যে মার বাধাটুকু বীণা কোনদিন ভুলতে পারবে না। বীণার মা বলেছিলেন, 'আমার কোন আপত্তি নেই, এ রকম বিয়ে তো আজকাল হয়ই। কিন্তু ওই থাইসিস ধরা বংশের ছেলে। সেই জন্যই ভয়। কথা যখন শুনবিনে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।'

অনেক বিষের মধ্যে এক ফোঁটা অমৃত। মায়ের কোলের মধ্যে মুখ চেপে বীণা বলেছিল, 'আমার ভাগ্য খুব ভালো মা, তুমি ভেব না।'

জমা খরচের খাতা হাতে গিরীনবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়েছিলেন।

দূর থেকে মহেশবাবুও টাকা আর শাড়ি দিয়ে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন ; কিন্তু অসবর্ণা পুত্রবধূকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকতে রাজী হন নি।

বীণা আমার দিকে তাকিয়ে এবার হাসল, 'তাছাড়া এখন তো ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই আর। আমার এক ননদ তাঁর স্বামী আর ছেলে পুলে নিয়ে খুলনা থেকে এসে উঠেছেন ওখানে। সে বাসায় আর তিল ধরবার জায়গা নেই।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা নয়টা বেজে গেছে।

বললাম, 'এবার উঠতে হয়। আপনার ডিউটি কখন?'

বীণা বলল, 'ডিউটি নেই। ছুটি নিয়েছি। শরীরটা ভালো না। আমার এক মামা থাকেন সিংভূমে। ভেবেছি, সেখানে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসব।'

বীণার দিকে তাকালাম। ওর পরনে আটপৌরে খয়েরী রঙের শাড়ি। কিন্তু কানে আজ আভরণ দেখলাম। হাতে দু'গাছি চুড়ি। হয় তো বিয়ের সময় মার কাছ থেকে পেয়ে থাকবে। তাহলে গয়না পরবার সখ যে ওর একেবারে নেই তা নয়। এতদিন চাপা ছিল। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ আজ ক্ষীণ নয়, স্পষ্ট। মৃন্ময়ের কথা মনে পড়ল। সুন্দর মুখ ছাড়া সিঁদুর মানায় না। ও একদিন বলেছিল। কিন্তু সিঁদুরও অনেক মুখকে সুন্দর করে। বেশ ভরে উঠছে শরীর।

বললাম, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।'

বীণা চোখ নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না হওয়াই ভালো ছিল। ডাক্তার বলেছেন, 'এ অবস্থায় বিশ্রাম না নিলে মুসকিল হবে। কিন্তু আমাদের কি ছুটি নিলে চলে।'

অস্ফুট স্বরে বললাম, 'ও।'

একটু বাদে আমি বললাম, 'মৃন্ময় প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল। সত্যিই নিয়েছিল নাকি কিছু! গিরীনবাবুর চাকরিবাকরি অক্ষত আছে তো?'

বীণা বলল, 'তা আছে। সে আর কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করেনি, বরং উপকারই করেছে। মার অসুখের সময় শুনেছি সাহায্য করেছে খুব। তার মুখ যতটা খারাপ মন ততটা খারাপ নয়।'

আমি তার দিকে তাকাতেই বীণা মুখ নামাল।

বললাম, 'সুস্মিতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে?'

বীণা বলল 'না। সুস্মিতার বাবা নাকি ওর বাবার পণ যৌতুকের সব দাবীই মেনে নিয়েছিলেন। পাকা কথাও দুজনের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে নিজেই সব ভেঙ্গে দিয়েছে। বলেছে কোন দিন নাকি বিয়ে করবে না।'

একটু উদ্বেগ আর আশঙ্কার সুর যেন শুনতে পেলাম বীণার গলায়।

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'আমার কি মনে হয় জানেন। মৃন্ময় শেষ দিকে যে ব্যবহার আপনার সঙ্গে করেছে সেও এক ধরণের ভালোবাসা।'

বীণা আমার দিকে তাকাল, 'তা হবে। কিন্তু দুজনের ভাষা তখন আলাদা, বুঝবার উপায় ছিল না।'

আমি একটি অশোভন আর অবান্তর প্রশ্ন করলাম, 'আজ বুঝতে পারছেন!'

বীণা একথার কোন জবাব না দিয়ে চায়ের কাপ ডিসটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

একটু বাদে ফের এসে বসল আমার সামনে।

বললাম, 'এবার আপনাকে নিয়ে আর একবার লেখার চেষ্টা করা যাবে। অনেক কথাই তো শুনলাম।'

বীণা বলল, 'না একটা কথা এখনো বাকি।'

'বলুন।'

বীণা বলল, 'আমার ছোট এক দেওরের কথা আপনাকে দু'একদিন বলেছি বোধ হয়। নিরাপত্তা আইনে দেড় বছর আটক আছে। সেদিন তাকে আলিপুরে দেখতে গিয়েছিলাম। নির্মলের চেহারা দেখে আমার কমলার কথা মনে পড়ল। উনিশ কুড়ি বছরের বেশী বয়স হবে না। কিন্তু শরীরে আর কিছু নেই। বললাম, কেমন আছ ঠাকুরপো। ও বলল, ভালো।'

বীণা একটু থামল।

বললাম, 'তারপর।'

বীণা বলল, 'খুব বেশীক্ষণ তো আর কথাবার্তা হতে পারল না। দু'চার কথার পর হঠাৎ বলল, 'আমার একটা গল্পের খাতা বাসায় রয়ে গেছে বউদি। দেখ যেন হারিয়ে না যায়।' তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার কথা মেজদার কাছে আরো শুনেছি। এবার বেরিয়ে গিয়ে তোমাকে নিয়ে লিখব।'

'বললাম, আমাকে নিয়ে? আমাকে নিয়ে কি লিখবার আছে ভাই।' নির্মল বলল, 'আছে বৈকি। আমার কাছে ক'দিন লুকিয়ে রাখবে। আমি তোমার সব কথা তন্নতন্ন করে খুঁজে বার করব। একবার বেরুতে পারলে হয়।' বললাম,

'বেশ লিখো। তুমিই লিখো আমার কাহিনী। আমি যা শুধু হয়েছি তাই নয়, যা শুধু করেছি তাই নয়, জীবনভর যা আমি করতে চেয়েছি, হতে চেয়েছি, যা আমাকে হ'তে হবে, তার সব কথাই যেন তোমার লেখার মধ্যে থাকে। শুধু আমার কথাই নয়, তোমার লেখা যেন আমাদের কথায় ভরে ওঠে, নির্মল।' বলতে বলতে বীণার দুই চোখ ছলছল্ ক'রে উঠল।

আত্মসংবরণের জন্য ওকে একটু সময় দিলাম। তারপর খানিকটা তরল স্বরে বললাম, 'আমার প্লটটা তাহ'লে আর একজনকে দিয়ে এলেন বলুন।'

আমার বলবার ভঙ্গিতে বীণা একটু হাসল, তারপর বলল, 'আর্টিষ্ট মাত্রেই হিংসুটে, একজনের প্লট আর একজনকে কি দেওয়া যায়? একজনের প্লট আর একজন নিতেই কি পারে?'

বললাম, 'তা ঠিক।'

এতক্ষণ বাদে বিমলের ইজেলের ওপর আমার নজর পড়ল। পাতলা কালো রঙের একটি ঢাকনি রয়েছে ওপরে।

বললাম, 'বিমলবাবু কি আঁকছেন আজকাল একটু দেখে যাই।'

বীণা বলল, 'আঁকছেন আর কই। এখনো পরীক্ষা নীরিক্ষাই চলছে।' তারপর আস্তে আস্তে ঢাকনিটা তুলে ফেলল।

ক্যানভাসে একটি অসম্পূর্ণ ছবি। কোন অফিসের ভিতরকার খানিকটা অংশ। সুইচ বোর্ডের সামনে সারি সারি অনেকগুলি ফোন অপারেটার কাজ করছে। অনেকেই হৃত স্বাস্থ্য অনেকেই শ্রান্ত। কিন্তু চোখে মুখে তাদের এক অদ্ভুত দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। আর সামনের দিকের দুটি মেয়ের মুখের সঙ্গে বীণা আর কমলার মুখের আদল ভেসে আসছে? তাদের যেন একটু একটু চেনা যায় আবার যায়ও না।

হেসে বললাম 'বিমলবাবুর বিষয়বস্তু বদলাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। স্বামীকে শোধরাচ্ছেন বুঝি?'

বীণা বলল 'ওকি কথা। আপনাদের কি শোধরানো যায়। আপনারা নিজেরাই পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হন।'

বললাম, 'তবু ভালো।'

বীণা সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিল। নমস্কার বিনিময়ের পর বিদায় নিলাম।

গলির মুখে বিমলের সঙ্গে দেখা। হাতে একটা রঙের বাক্স। বোধহয় বাজারে কিনতে বেরিয়েছিল। দেখলাম বাইরের দিক থেকে কিছুই বদলায়নি। তেমনি এলোমেলো বেশবাস। হাঁটবার তাকাবার তেমনি উদাসীন অন্যমনস্ক ভঙ্গি।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে বিমল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, 'কিছু মনে করবেন না আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি।'

বললাম, 'কিছু মনে করবেন না। সে কথা আর একদিন বলব।'

পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে বড় রাস্তার দিকে এগুতে লাগলাম।

অফিসের বেলা হয়েছে।